পার্টি দলিল

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে

২-৬ এপ্রিল ২০১৩

রাঁচী , ঝাড়খণ্ড

সি পি আই (এম এল) লিবারেশন

পার্টি দলিল

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে

নবম পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত
রাঁচী (বীরসা নগর), ঝাড়খণ্ড
২-৬ এপ্রিল ২০১৩

সি পি আই (এম এল) লিবারেশন

পার্টি দলিল
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে

৯ম পার্টি কংগ্রেস
২-৬ এপ্রিল ২০১৩
রাঁচী (বীরসা নগর)
ঝাড়খণ্ড

প্রকাশক :
কেন্দ্রীয় কমিটি
সি পি আই (এম এল) লিবারেশন
প্রভাত কুমার
চারু ভবন
ইউ - ৯০, শকরপুর, দিল্লী - ১১০০৯২
দূরভাষ : ০১১ - ২২৫৩১০৬৭
০১১ - ২২৪৮১০৬৭
ফ্যাক্স : ০১১ - ২২৪৮১১৬৫
ই মেল : mail@cpiml.org

মূল্য : ১০ টাকা

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে

১। বিশ্ব পুঁজিবাদ দীর্ঘমেয়াদি মন্দার ফাঁদে আটকে রয়েছে যা ১৯৩০-এর দশকের মহামন্দার পর অর্থনীতির তীব্রতম অবনমন বলেই ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হয়েছে। ওবামা প্রশাসন এখন যদিও ক্রমবর্ধমান পুনরুজ্জীবনের কথা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকটি দৈত্যাকার আর্থিক সংস্থার পতনের সময় থেকে পাঁচ বছর কেটে যাওয়ার পর 'সংকট অবসানের শুরু' হওয়ার কথা বলছেন, সংকট প্রশমনের কোনো লক্ষণ কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। মার্কিন অর্থনীতিই, যা এখনও পৃথিবীর বৃহত্তম অর্থনীতি, এই সংকটের উৎপত্তিস্থল হলেও বিশ্ব পুঁজিবাদের একীকরণের যুগে আজ সংকট সারা পৃথিবীতেই অনুভূত হচ্ছে। ক্ষেত্রের দিক থেকে বলতে গেলে, আর্থিক ক্ষেত্রেই সংকটটা তীব্র রূপে ফেটে পড়ে, আর এখনকার পুঁজিবাদ যেহেতু প্রধানত আর্থিক পুঁজিবাদ, তাই এই সংকট বিশ্ব অর্থনীতির প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ দিককেই ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। যা শুরু হয়েছিল বিত্তীয় সংকটের রূপে তা পরিণত হয়েছে দীর্ঘস্থায়ী ও সর্বাঙ্গীণ অর্থনৈতিক সংকটে।

২। এই সংকটের মোকাবিলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার সঙ্গে এখন ক্রমেই আরও বেশি বেশি করে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন, যে পন্থা অবলম্বন করছে তা হল দেউলিয়া হয়ে পড়ার মতো অবস্থায় টলমল করা ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে উদ্ধার করা, আর শ্রমজীবী জনগণের ওপর কঠোর ব্যয় সংকোচের পদক্ষেপগুলোকে চাপিয়ে দেওয়া। এর ফলে একদিকে যখন সরকারগুলোর ক্রমবর্ধমান ঋণগ্রস্ততার মূল্যে বহুসংখ্যক বড় বড় কর্পোরেশনকে নিশ্চিত পতনের হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছে, অন্যদিকে তখন ক্রমবর্ধমান বেকারি ও ক্রমহ্রাসমান মজুরির ধাক্কায় শ্রমজীবী জনগণ চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আই এল ও) সর্বশেষ বিশ্ব কর্মসংস্থানের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কিত রিপোর্টে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে যে, সারা বিশ্বে বেকারের সংখ্যা বেড়ে ২০১৩ সালে দাঁড়াবে ২০ কোটি ২০ লক্ষে। সংখ্যাটা এর আগের ২০০৯ সালের ১৯ কোটি ৮০ লক্ষের রেকর্ডকে ছাপিয়ে যাবে এবং বেকারির হার ২০১৭ সাল পর্যন্ত বাড়তে থাকবে। এটা কিন্তু খুবই কম মাত্রার হিসাব, কেননা ভারতের মতো দেশগুলোর কোটি কোটি বেকারের সংখ্যা এর মধ্যে ধরা নেই, যারা বেকার বলে সরকারের খাতায় নথিভুক্ত নয়। আই এল ও-র আনুমানিক হিসাব মতো ২০১১ সালে সারা বিশ্বে ১৫ থেকে ২৪ বছরের ৭ কোটি ৫০ লক্ষ যুবক-যুবতী বেকারির কবলে পড়েছে, যা সমস্ত যুবক-যুবতীর সংখ্যার ১২ শতাংশের বেশি।

৩। অর্থনৈতিক সংকট সারা বিশ্বজুড়ে শাসকদের নীতির বিরুদ্ধে জনগণের শক্তিশালী প্রতিবাদের জন্ম দিয়েছে, নয়া-উদারবাদী মতান্ধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে এবং এমনকি বেশ কিছু সরকারের পতনও ঘটিয়েছে। বিশেষভাবে তিনটি আন্দোলন সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অকুপাই আন্দোলন, আরব বসন্ত এবং ইউরোপে ব্যয় সংকোচের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। অতি সম্প্রতি ২০১২-র ডিসেম্বরে ভারতে

ফেটে পড়া যৌন হিংসার বিরুদ্ধে আন্দোলনও বিশ্বের অনুভূতিতে নাড়া দিয়েছে এবং এর মধ্যে এন জি ও-দের নেতৃত্বে নারী আন্দোলন ক্রমান্বয়ে কব্জা হয়ে পড়ার হাত থেকে বেরিয়ে এসে নারীদের রাজনৈতিক আত্মঘোষণার নতুন জোয়ার সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আরব বসন্তের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সংকট বরং পৃষ্ঠভূমি হিসাবেই কাজ করেছে, আর এই সমস্ত দেশে গভীরে শিকড় গাড়া স্বৈরতান্ত্রিক শাসন থেকে মুক্তির আকাঙ্খাই প্রতিবাদের সবচেয়ে শক্তিশালী উৎস হয়ে উঠেছে। প্রতিবাদগুলো ২০১১ সালে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায় এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও অব্যাহত রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বারাক ওবামা অকুপাই আন্দোলন থেকে স্বল্পমেয়াদী সুবিধা উশুল করেন এবং রিপাবলিকানদের অধীনে আরও কট্টর দক্ষিণপন্থী প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনাকে বানচাল করে দ্বিতীয়বারের জন্য বিজয়ী হন। আর আরব দুনিয়ায় ইতিমধ্যেই চার চারটি সরকারের পতন হয়েছে এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশে ব্যাপক বিক্ষোভ এবং এমনকি গৃহযুদ্ধও ফেটে পড়ছে। উত্তাল পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চলে তার রাজনৈতিক-সামরিক হস্তক্ষেপকে গভীরতর করে তুলেছে এবং তা করেছে যখন ইসলামপন্থী দলগুলো গোটা আরব দুনিয়াতে আপাতভাবে সবথেকে শক্তিশালী রাজনৈতিক ধারা হিসাবে উঠে এসেছে। বিশ্ব পুঁজিবাদের বর্তমান সংকট বিশ্বের বিভিন্ন অংশে কমিউনিস্ট এবং অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তিগুলোর কাছে স্বৈরতান্ত্রিক, যুদ্ধবাজ এবং পুঁজিবাদী বিপর্যয়ের শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ও এগিয়ে যাওয়ার প্রচুর সুযোগের দরজা খুলে দিয়েছে।

৪। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৯/১১-র পর যে তথাকথিত 'সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ' শুরু করে (ঐ যুদ্ধের নাম পাল্টে তাকে এখন সন্ত্রাসের যুদ্ধ বলাই উচিত) তা এশিয়া এবং আফ্রিকার নতুন নতুন অঞ্চলে বিস্তার লাভ করছে যেখানে সর্বপ্রথম আক্রান্ত দুটি দেশ আফগানিস্তান ও ইরাকে এই যুদ্ধ এক দশকেরও বেশি সময় ধরে জারি রয়েছে। সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করা এবং গণতন্ত্রকে মদতের নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার ন্যাটোর মিত্ররা নিত্যনতুন অজুহাত খাড়া করে এবং নতুন নতুন দেশকে লক্ষ্যবস্তু করে তুলে এটাকে স্থায়ী যুদ্ধে পরিণত করেছে। সাদ্দাম হুসেনকে হত্যা করে ইরাক দখলের পর মার্কিন-ন্যাটো অক্ষ-র পরবর্তী লক্ষ্যবস্তু হয় লিবিয়া এবং তারা লিবিয়ার একদা দোর্দণ্ডপ্রতাপ শাসক মুয়াম্মর গদ্দাফিকে হত্যা করে এবং এখন আবার সিরিয়ায় জমানা বদলের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। একইভাবে, আলকায়দা প্রধান ওসামা বিন লাদেনকে পাকিস্তানে হত্যা করার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মতো তার মিত্ররা সারা আফ্রিকায় আলকায়দার ভূতগুলোকে খুঁজে বার করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। পশ্চিমের সেনাবাহিনী শাসকদের 'রক্ষা করা' এবং খনি ও তেল ক্ষেত্রগুলোকে 'পাহারা দেওয়া'র আপাত যুক্তিতে ইতিমধ্যেই মালি ও নাইজারে প্রবেশ করেছে। পেন্টাগন ইতিমধ্যেই একটি আফ্রিকান কম্যান্ড (আফ্রিকম) গড়ে তুলেছে এবং আফ্রিকার ৩৫টি দেশে মার্কিন সেনাবাহিনী ছড়িয়ে রয়েছে। পূর্বতন যে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো একদা আফ্রিকার ব্যাপক অংশকে নিয়ন্ত্রণ করত সেই ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সক্রিয় সহযোগিতায় মার্কিন অনুসৃত এই আগ্রাসী রণনীতির মূল লক্ষ্য হল আফ্রিকার সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক সম্পদকে গ্রাস করা এবং আফ্রিকার দেশগুলোর সঙ্গে চীনের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সম্পর্ককে প্রতিহত করা।

৫। যুদ্ধের দ্রুত অবসান ঘটানোর জনগণের প্রত্যাশাই বিপর্যয়কর বুশ জমানার শেষে ওবামাকে প্রথম কালো প্রেসিডেন্ট হতে সাহায্য করে, কিন্তু এই প্রত্যাশার বিপরীতে ওবামার শাসনকালে একইভাবে যুদ্ধের বিস্তার ঘটে চলেছে। ওবামা অবশ্য ওয়াশিংটনের যুদ্ধ রণনীতিতে কিছু পরিবর্তন এনেছেন। তিনি প্রত্যক্ষ দখলদারির ওপর কম গুরুত্ব দিয়ে চালকবিহীন বিমান থেকে বোমা বর্ষণ করা, অর্থাৎ কুখ্যাত ড্রোন হামলার মাধ্যমে তথাকথিত ''নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের লক্ষ্যবস্তু করে হত্যা'' করা এবং জমানা পরিবর্তনের মার্কিন প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন বিদ্রোহী আরব গোষ্ঠীকে সাহায্য করার ওপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ড্রোন হানাদারিগুলোকে চূড়ান্ত গোপনীয়তার মধ্যে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের মিত্র পাকিস্তান সহ বিভিন্ন দেশের সার্বভৌম অধিকারকে বেপরোয়াভাবে লঙ্ঘন করে চালানো হচ্ছে; পাকিস্তান, ইয়েমেন ও সোমালিয়ায় ড্রোন হানাদারিতে নিহতের সংখ্যা হাজার হাজার, যাদের মধ্যে অধিকাংশই নারী ও শিশু সহ সাধারণ নাগরিক এবং 'লক্ষ্যবস্তু বানানো সন্ত্রাসবাদী'দের তালিকার সঙ্গে যাদের নামের ক্ষীণতম সম্পর্কও নেই। কোনো ধরনের স্বচ্ছতা বা আইনি প্রক্রিয়ার আশ্রয় ছাড়াই মার্কিন নাগরিকদের হত্যার আদেশ দেওয়ার ক্ষমতাও ওবামা এখন নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন।

৬। লাগাতার চলতে থাকা 'সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ' যুদ্ধবাজ দেশগুলোর, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের অভ্যন্তরেও গভীর ও গুরুতর প্রভাব ফেলেছে। এই দেশগুলোর নানান মুসলিম সম্প্রদায়কে অপরাধী সাব্যস্ত করা হচ্ছে এবং দমনমূলক আইনের সাহায্যে ও প্রচার মাধ্যমে ঘৃণামূলক অভিযান চালিয়ে তাদের সন্ত্রস্ত করা হচ্ছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর নামে মৌলিক নাগরিক স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয়েছে এবং গোপন সাক্ষ্য, গোপন আদালত, ধৃতদের তাদের দেশে সমর্পণ, নাগরিকত্ব বাতিল এবং বেআইনিভাবে শত্রুহস্তে সমর্পণের মতো পদক্ষেপের ফলে অনেকেরই মৃত্যু ঘটেছে, অনেকে নিখোঁজ হয়ে গেছেন এবং জেলে পোরার অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে। এই সমস্ত কিছুই ঘটানো হয়েছে বিচারের সামান্যতম প্রহসনটুকু না দেখিয়েই, তা সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরেই হোক, কিংবা গুয়ান্তানামো বা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা মার্কিনের অসংখ্য গোপন কয়েদখানাগুলোর মধ্যে দিয়েই হোক।

৭। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরই পৃথিবীতে যুদ্ধ ও আগ্রাসনের অন্য উৎসটি হল পরিপূর্ণ মার্কিন মদতে পুষ্ট ইজরায়েল। ইজরায়েল এশিয়ায় আমেরিকার সবচেয়ে বিশ্বস্ত সামরিক মিত্র হিসাবে এবং তার প্রধান শত্রুরূপে ইসলামকে তুলে ধরা ও বিশেষভাবে আরব দুনিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে আমেরিকার একনিষ্ঠ মতাদর্শগত মিত্র হিসাবে কাজ করে। সমস্ত শান্তি চুক্তি এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রস্তাবগুলোকে অগ্রাহ্য করে ইজরায়েল প্যালেস্তাইনের ওপর দাদাগিরি চালিয়ে যাচ্ছে এবং অন্তহীন যুদ্ধাপরাধগুলো সংঘটিত করে চলেছে। বস্তুত, ইরাক ও লিবিয়া মার্কিনের নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ায়, সিরিয়া মার্কিন চালিত আর একটা জমানা পরিবর্তনের ধাক্কায় টলমল করায় এবং ইরান মার্কিন ও ন্যাটো শক্তির ঘেরাওয়ের মধ্যে থাকায় ইজরায়েল বর্তমান সন্ধিক্ষণকে প্যালেস্তিনীয় অঞ্চলের ওপর তার দখলদারি বিস্তারের এক বড় রাজনৈতিক ও সামরিক সুযোগ হিসাবে দেখছে।

গাজার ওপর সাম্প্রতিক আক্রমণ, নিরীহ প্যালেস্তিনীয় জনগণের হত্যা এবং অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবাগুলোর বিপুল ও সুপরিকল্পিত ধ্বংস গোটা গাজাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে প্যালেস্তিনীয়দের জমিতে একচেটিয়া ইহুদি বসতিগুলো স্থাপনের মাধ্যমে সেখান থেকে প্যালেস্তিনীয়দের বিতাড়িত করার ইজরায়েলের অভিপ্রায়কেই দেখিয়ে দেয়। প্যালেস্তাইনকে কার্যত এক বিশাল বন্দিশিবিরে পরিণত করা হয়েছে — যা হল প্যালেস্তাইনের জমি ও জনগণের ওপর নাজি জমানার ইহুদি নিধনযজ্ঞেরই পরিহাসময় পুনরাবৃত্তি। এই প্রেক্ষাপটে কিছুদিন আগে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় প্যালেস্তাইনকে ''অ-সদস্য পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র''-র মর্যাদা দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে যা পরোক্ষে প্যালেস্তাইন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে। প্রস্তাবের পক্ষে পড়ে ১৩৮টি ভোট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইজরায়েল ও কানাডা সহ ৯টি দেশ প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেয় এবং ব্রিটেন ও জার্মানি সহ ৪১টি দেশ ভোটদানে বিরত থাকে; এই পদক্ষেপ অনেক বিলম্বিত ও প্রতীকী চরিত্রের হলেও প্যালেস্তিনীয় জনগণের নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিজয়কেই দেখিয়ে দেয়। মার্কিন-ইজরায়েল গাঁটছড়াই আজ বিশ্বে শান্তি ও স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে রয়েছে, আর তাই বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলোকে এই গাঁটছড়ার বিরুদ্ধে তাদের লড়াইকে তীব্রতর করতে তুলতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক বিষয় হল, তাকে বিচ্ছিন্ন করা এবং হুমকি দিয়ে বশীভূত করার মার্কিনের মরিয়া প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে ইরান ২০১২-র আগস্ট মাসে তেহরানে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের ষোড়শ শীর্ষ বৈঠক সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়।

৮। অর্থনৈতিক সংকট এবং মার্কিন নেতৃত্বাধীন বিশ্বব্যাপী স্থায়ী যুদ্ধ অভিযানের পাশাপাশি বিশ্ব আজ পুঁজিবাদ-সৃষ্ট ধ্বংসের তৃতীয় মাত্রাটিকেও অত্যন্ত তীব্রভাবে প্রত্যক্ষ করছে। এটা হল বিদ্যুৎ সংকট ও পরিবেশগত বিপর্যয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার পশ্চিমী মিত্ররা তেল, গ্যাস ও কয়লার মতো মূল বিদ্যুৎ সম্পর্কিত সম্পদগুলোর ওপর তাদের কব্জাকে শক্তিশালী করার মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তারা ক্রমেই আরও বেশি বেশি করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জমি গ্রাস করে নিজেদের বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োজনীয়তাকে সুরক্ষিত করতে সেখানে জৈব-জ্বালানির চাষকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং এইভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর কৃষি অর্থনীতি, খাদ্য নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বকে ধ্বংস করছে। তথাকথিত সন্ত্রাস-বিরোধী যুদ্ধ অবশ্যই হল সম্পদের দখল নেওয়া এবং বিশ্বের বিদ্যুৎ অর্থনীতির ওপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ কায়েমের যুদ্ধ। ইতিমধ্যে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে যখন পারমাণবিক শক্তির অন্তর্নিহিত বিপদ ব্যাপকভাবেই স্বীকৃত হয়েছে এবং প্রায় সমস্ত উন্নত দেশই অধিকতর নিরাপদ ও সস্তা শক্তির অন্যান্য উৎসের দিকে ঝুঁকছে, তখন চেরনোবিল ও ফুকুসিমার ভয়াবহ অভিজ্ঞতার পরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য বড় পারমাণবিক শক্তিগুলো তাদের বাতিল করা পরমাণু প্রযুক্তিকে ভারতের মতো দেশগুলোতে বিক্রির তোড়জোড় করছে।

৯। বিশ্ব উষ্ণায়ন বা আবহাওয়ার পরিবর্তন আজ আর শুধু ভবিষ্যতের বিপন্নতাকেই সূচিত করছে না; তা ইতিমধ্যেই পৃথিবীর সমস্ত রূপের প্রাণের কাছেই ভয়াবহ মাত্রা পরিগ্রহ করেছে। ১৯৯৭-এর কিয়েটো চুক্তি উন্নত দেশগুলোর জন্য —

পরিবেশের বিপর্যয়ের জন্য মূলত যারাই দায়ী — কার্বন ডাই অক্সাইড ও অন্যান্য গ্রিন হাউস গ্যাসের মাথাপিছু নিঃসরণ কমানোর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে দিয়েছিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তিরাষ্ট্র ও অন্যান্য কয়েকটি উন্নত দেশ কিয়েটো চুক্তিকে বিপথগামী করে ও তাতে অন্তর্ঘাত হানে এবং অবশেষে ২০১১ সালে ডারবানে অনুষ্ঠিত আবহাওয়া পরিবর্তন সম্পর্কিত সম্মেলনে তারা চীন ও ভারতের মতো দেশগুলোর কাঁধে বৈষম্যমূলকভাবে অত্যাধিক বোঝা পাচার করে দিতে সমর্থ হয়। মাথাপিছু নিঃসরণের মাপকাঠিকে খারিজ করে দিয়ে এবং এইভাবে আবহাওয়া সংক্রান্ত সংকটের মোকাবিলায় সমতা ও ন্যায়ের ধারণাকে জলাঞ্জলি দিয়েই তারা সেটি করে। উন্নত দেশগুলো তৃতীয় বিশ্বকে তাদের বিষাক্ত বর্জ্যের আঁস্তাকুড় হিসাবে ব্যবহারেরও চেষ্টা করছে। পরিবেশগতভাবে ভারসাম্য রক্ষাকারী উন্নয়নের মডেলের জন্য লড়াইকে তাই উন্নত দেশগুলোর চাপিয়ে দেওয়া ধারাবাহিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানাতে হবে।

১০। তথ্যপ্রযুক্তির অভাবনীয় বিকাশ, বিশেষভাবে যোগাযোগ ও জনগণের মধ্যে তথ্যকে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যম হিসাবে ইন্টারনেটের বিপুল বৃদ্ধি কর্পোরেট-বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রতিরোধের সুবিপুল সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত করেছে। কর্পোরেট-সাম্রাজ্যবাদী গোপন বিষয়গুলোকে উন্মোচিত করার অস্ত্র হিসাবে, বস্তুগত ও মতাদর্শগত দিক থেকে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমাবেশের হাতিয়ার হিসাবে এবং জ্ঞান ও তথ্যের জগতের ওপর পুঁজিবাদী একচেটিয়াপনার ভিত্তিটাকেই প্রতিরোধ করার পন্থা হিসাবে এই নতুন মাধ্যমের সম্ভাবনাকে ইতিমধ্যেই উপলব্ধি করা যাচ্ছে। এই কারণেই পুঁজির ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা ইন্টারনেটের স্বাধীনতাকে খর্ব ও বিপর্যস্ত করে তোলার পথ খুঁজে বার করার মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এই চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিয়ে এবং তথ্যপ্রযুক্তি ও ইন্টারনেট স্বাধীনতার দিগন্তকে সম্প্রসারিত করে তুলে পুঁজি ও কর্পোরেট-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের আক্রমণের বিরুদ্ধে আরও বড় আঘাত হানাটা সারা বিশ্বেই জনগণের সংগ্রামের সামনে এক গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসাবে হাজির হয়েছে।

১১। এক মেরু বিশ্বে চূড়ান্ত ও স্থায়ী আধিপত্যের মার্কিন স্বপ্ন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। বর্তমান মন্দা যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কঠিন ধাক্কা দিয়েছে, তখন বর্তমানে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি চীন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অনেক কম এবং সে ক্রয়ক্ষমতার সমতার নিরিখে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ২০২০ সাল নাগাদ ছাড়িয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই যথেষ্ট মাত্রায় পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সত্ত্বেও উভয় শক্তির মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্রতর হয়ে উঠছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার স্বীকৃতির মতোই ইউরোপীয় ইউনিয়নকে যদি একটি একক সত্ত্বা হিসাবে ধরা যায়, তবে তা আকারে ইতিমধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে গেছে। চীনের নেতৃত্বাধীন ব্রিকস (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা — চীনে ২০১১-র এপ্রিলে এই গোষ্ঠীর তৃতীয় শিখর সম্মেলনের পর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়) এক শক্তিশালী অর্থনৈতিক গোষ্ঠী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে — যদিও সংকট তার প্রাথমিক ঔজ্জ্বল্যকে অনেকটাই হরণ করে নিয়েছে। উদীয়মান অর্থনীতির তালিকাভুক্ত দেশগুলোকে (এই বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন তালিকা

রয়েছে — বিশ্ব ব্যাঙ্ক ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ছাড়াও দক্ষিণ কোরিয়া ও ইন্দোনেশিয়াকে ছটি উদীয়মান অর্থনীতি বলে স্বীকৃতি দেয়) ব্যাপকভাবেই এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি রূপে স্বীকার করা হয় যা আগেকার জি-৭ ভুক্ত দেশগুলোর (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, কানাডা ও জাপান) প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছে। তাই জি-৭ গোষ্ঠী জি-২০ গোষ্ঠীর মধ্যে বেশ কিছু উদীয়মান অর্থনীতিকে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক অস্ত্রটা হল বিনিময়ের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড হিসাবে বিশ্বস্তরে তার মুদ্রার নিরঙ্কুশ স্বীকৃতি এবং যেদিন সেই আধিপত্যকারী অবস্থান থেকে ডলারের পতন ঘটবে সেদিন বিশ্ব অর্থনীতির ভারসাম্যে আমূল পরিবর্তন ঘটে যাবে। ডলারের আধিপত্যের অবসান এবং তার জায়গায় বিকল্প কোনো ব্যবস্থার প্রবর্তনই হল সারা দুনিয়ার কাছে প্রয়োজনীয় সবচেয়ে জরুরি বিশ্বস্তরের অর্থনৈতিক সংস্কার।

১২। সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য বজায় রয়েছে, যদিও বহুমেরুমুখী একটি বস্তুগত প্রবণতাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বহুমেরুমুখী এই প্রবণতার সাক্ষ্য বহন করছে চীন, রাশিয়া এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙ্গন থেকে উদ্ভুত অন্য চারটি দেশকে নিয়ে গঠিত সাংহাই সহযোগিতা সংঘের আত্মপ্রকাশ এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বস্তরে মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোটের উত্থানের পরপরই ইউরোপীয় ইউনিয়নের সম্প্রসারণ ও সংহতির গতি মন্থর হয়ে পড়েছে। অবশ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাক ও আফগানিস্তানে আটকে পড়ায় এবং তার অর্থনীতি চলমান সংকটে তীব্র ধাক্কা খাওয়ায় তার কব্জা শিথিল হতে শুরু করেছে। রাশিয়া এবং চীনের যৌথ ও লাগাতার বিরোধিতা ইরান ও বর্তমানে সিরিয়া সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতলব সিদ্ধিকে প্রতিহত করেছে। অর্থনৈতিক ও সামরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সাংহাই সহযোগিতা সংঘ ক্রমান্বয়ে এক শক্তিশালী জোট হিসাবে উদ্ভুত হচ্ছে এবং ইরান, ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানকে পর্যবেক্ষক রূপে অন্তর্ভুক্ত করায় তার সক্রিয়তার ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ ঘটেছে। ন্যাটো জোটের অন্যতম সদস্য তুরস্ক সাংহাই সহযোগিতা সংঘের ২০১২ সালের শীর্ষ বৈঠকে আলাপ-আলোচনার অংশীদার হিসাবে অংশগ্রহণ করে।

১৩। বহুমেরুমুখী প্রবণতা কাজ করে চলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এক জটিল জালের মধ্যে দিয়ে, তবে বিশ্বজুড়ে পুনরুজ্জীবিত গণপ্রতিরোধ ও গণপ্রতিবাদের যে স্ফূরণ দেখা যাচ্ছে (যার মধ্যে একই সঙ্গে দুটি বুনিয়াদী দ্বন্দ্বের তীব্রতর হয়ে ওঠার প্রতিফলন ঘটছে — উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে শ্রম ও পুঁজির মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং সাম্রাজ্যবাদ ও তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে দ্বন্দ্ব) তার মধ্যে রয়েছে এক বিরাট সম্ভাবনা। এর ফলে সন্ত্রাসবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের চক্রকে ছাপিয়ে গিয়ে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট, বিশ্বব্যাপী স্থায়ী যুদ্ধ ও ক্রমবর্ধমান পরিবেশগত বিপর্যয় সৃষ্টি করে চলা মার্কিন নেতৃত্বাধীন নয়া-উদারবাদী ব্যবস্থা বিরোধী যে রাজনৈতিক ভারসাম্য গড়ে উঠেছে তা ঘুরে যেতে পারে।

১৪। চীন ১৯৭৮ সাল থেকে ক্রমেই আরও বেশি বেশি করে শক্তিশালী রাষ্ট্রীয়

হস্তক্ষেপ সহ এক নিয়ন্ত্রিত বাজার অর্থনীতির দিকে এগিয়ে চলেছে, যেটাকে তারা বলছে চীনা বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সমাজতন্ত্র নির্মাণ। ব্যাপক আকারে বাজার অর্থনীতির আশ্রয় নেওয়ার ফলে চীন বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অর্থনীতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেও তা চীনের অভ্যন্তরে সামাজিক ও আঞ্চলিক বৈষম্যকে যথেষ্ট মাত্রায় তীব্রতর করে তুলেছে। আমাদের অষ্টম কংগ্রেসে আমরা বলেছিলাম, বাজারমুখী বেসরকারী পুঁজিমুখী সংস্কারের প্রক্রিয়ায় চীন ''সমাজতন্ত্রের দিকে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতির দিক থেকে ক্রমেই আরও দূরে সরে গেছে'' এবং ''অর্থনৈতিক ভিত্তিতে ব্যাপকভাবে পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিকাশ স্বাভাবিকভাবেই উপরিসৌধে ক্ষমতাসীন পার্টির রাজনীতি, নীতি নির্ধারণ ও অগ্রাধিকারের বিষয়গুলোর ওপর তার প্রভাব ফেলেছে। এমনকি তার প্রভাব পড়েছে সদস্যদের আচার-আচরণের ওপরও''। তারপর থেকে বিচ্যুতির এই ধারা অব্যাহত রয়েছে, যাতে ক্রমবর্ধমান তাঁবেদারি ও দুর্নীতি লক্ষ্য করা গেছে; দেখা গেছে বলপূর্বক জমি অধিগ্রহণ এবং বেসরকারী কারখানা ও খনিগুলোতে (বহুজাতিক সংস্থার মালিকানাধীন সহ) কাজের ভয়াবহ পরিবেশ ও নিম্ন মজুরির পরিঘটনা যা ঘনঘনই গ্রামাঞ্চলে বিদ্রোহ ও শ্রমিক ধর্মঘটের জন্ম দিয়েছে, যেগুলোকে সাধারণত কঠোরভাবে মোকাবিলা করা হয়েছে ও গোপন রাখার চেষ্টা হয়েছে; লক্ষ্য করা গেছে জাতীয় সংখ্যালঘুদের প্রান্তিকীকরণের ঘটনা যা জিনজিয়াং সংঘর্ষের মতো ঘটনায় (২০০৯) পরিণতি লাভ করেছে; লক্ষ্য করা গেছে সমাজের মধ্যে ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে বুর্জোয়া ভোগবাদ ও সামন্ততান্ত্রিক-পিতৃতান্ত্রিক প্রবণতা সহ সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের পরিঘটনা এবং এই ধরনের আরও অনেক ব্যাধি।

১৫। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি অবশ্য একগুচ্ছ নির্দেশিকার ভিত্তিতে এই সমস্ত সমস্যা মোকাবিলার চেষ্টা করছে, যথা, এর আগে জারি করা ''সমাজতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় মূল্যবোধ ব্যবস্থা'' এবং ''সমাজতান্ত্রিক সমন্বয়ী সমাজ''-এর নীতি এবং সর্বশেষ (অষ্টাদশ) পার্টি কংগ্রেসে তুলে ধরা ''উন্নয়ন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী''র নীতি। তবে মতাদর্শগত-রাজনৈতিক ধারার আমূল শুদ্ধিকরণের অনুপস্থিতিতে এমন কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না যার ভিত্তিতে বলা যায় যে, চীনের চমকপ্রদ অর্থনৈতিক বৃদ্ধি গণতন্ত্র, সমতা বা একটি পুরনো শ্লোগান অনুসারে, ''সমাজতান্ত্রিক আত্মিক সভ্যতা''র ক্ষেত্রে কোনো অবদান রাখছে। চীন সম্পর্কে আমাদের উদ্বেগ বিংশ শতকের সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠিত ধরন থেকে তার প্রস্থান বা কঠিন আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় তার উদ্ভাবনমূলক প্রয়াস নিয়ে নয়; যা উদ্বেগের সৃষ্টি করে তা হল, বিপ্লবী সামাজিক রূপান্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত অপরিহার্য বন্ধনমুক্তির লক্ষ্যের প্রকট অনুপস্থিতি — যে রূপান্তর সামাজিক বৈষম্যকে কমিয়ে আনে এবং তাদের ঘাড়ের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা রাষ্ট্রের কাছ থেকে নিছক সুবিধা গ্রহীতার অবস্থান থেকে বুনিয়াদী জনগণকে উন্নীত করে দেশের প্রকৃত শাসকে। এটা অবশ্য তাৎপর্যপূর্ণ যে, বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্গে ক্রমবর্ধমানভাবে একাত্ম হওয়ার অনুশীলন চালানো সত্ত্বেও চীন তৎপর নীতিসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাপানের তুলনায় বর্তমান মন্দার অনিবার্য নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার মোকাবিলা অনেক ভালোভাবে করেছে,

যা অন্যান্য দেশের কাছে দৃষ্টান্ত বলে ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আমাদের চীনের ঘটনাবলীর বিকাশকে অধ্যয়ন করে যেতে হবে এবং দ্বিপাক্ষিক স্তরে ও তার সাথে সাথে ব্রিকস ও সাংহাই সহযোগিতা সংঘের মতো বহুপাক্ষিক মঞ্চের মধ্যে দিয়ে ভারত ও চীনের মধ্যে উন্নত সম্পর্কের সপক্ষে দাঁড়াতে হবে এবং এর পাশাপাশি চীনকে ঘেরাও ও নিয়ন্ত্রণ করার মার্কিন চক্রান্তে ভারতকে দাবার ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করে নেওয়ার দৃঢ় বিরোধিতা করতে হবে।

১৬। চীন আজ বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সমাজতান্ত্রিক কল্পনাকে অনুপ্রাণিত বা তাকে প্রতিফলিত না করলেও লাতিন আমেরিকা বিশ্বের অঙ্গনে বাম আন্দোলনের এক প্রাণবন্ত দুর্গ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সাম্প্রতিক অতীতে লাতিন আমেরিকার জনগণ এমন বেশ কিছু সরকারকে নির্বাচিত করেছেন যারা অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে নয়া-উদারবাদী নীতিমালার বিরোধিতা করে থাকে এবং যাদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাব রয়েছে। বলিভিয়া ও ভেনেজুয়েলা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের জাতীয়করণ করেছে এবং ইকুয়েডর সেই দেশে একটি মার্কিন সামরিক ঘাঁটিকে বন্ধ করে দিয়েছে। কয়েক দশক আগেও চিলি থেকে আর্জেন্টিনা পর্যন্ত বিস্তৃত যে অঞ্চল মার্কিনের মতদপুষ্ট একনায়তন্ত্রের অধীনে নয়া-উদারবাদী নীতিমালার উগ্র প্রয়োগের জন্য পরিচিতি ছিল, সেখানে এটা অবশ্যই এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিউবা ও ভেনেজুয়েলা যৌথভাবে গড়ে তুলেছে আমাদের আমেরিকার বলিভিয়ান জোট (আলবা), বলিভিয়া, ইকুয়েডর ও নিকারাগুয়া সহ যার সদস্য সংখ্যা এখন আট। আলবা মার্কিন আধিপত্যাধীন বাণিজ্যের বিরুদ্ধে এক বিকল্প গড়ে তুলছে যার লক্ষ্য হল পারস্পরিক সামাজিক কল্যাণ, পণ্যবিনিময় ও অর্থনৈতিক সহায়তার ওপর ভিত্তি করা আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংহতি। লাতিন আমেরিকার সংহতিকে গভীরতর করা ও মার্কিন আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানানোর লক্ষ্যে আলবার পর গঠিত হয়েছে সেলাক, যা হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাকে বাদ দিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার ৩৩টি সার্বভৌম রাষ্ট্রকে নিয়ে গঠিত লাতিন আমেরিকান ও ক্যারিবীয় দেশগুলোর এক জোট।

১৭। সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিরোধ করা এবং আঞ্চলিক সংহতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে লাতিন আমেরিকার জনগণের কাছে কিউবা এখনও অনুপ্রেরণার সবচেয়ে বড় উৎস হয়ে রয়েছে। কিউবার রাষ্ট্র ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ফিদেল কাস্ত্রোর পর্বত সমান উপস্থিতি পাঁচ দশক পর শেষ হয়েছে, ফিদেল জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন রাউল কাস্ত্রোকে, যিনি কিউবার বর্তমান প্রেসিডেন্ট এবং কিউবা কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান সম্পাদক। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিউবার কৃষি। ১৯৯০-এর দশক থেকে শুরু করে কিউবা কৃষিক্ষেত্রে পরিবেশ বান্ধব প্রক্রিয়ার বিকাশ ঘটিয়ে খাদ্য স্বয়ম্ভরতার পথে এগিয়ে চলেছে। কিউবা সম্প্রতি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিছু সংস্কার এনেছে, যার মধ্যে সীমিত মাত্রার ব্যক্তি মালিকানাধীন উদ্যোগও রয়েছে। এটা কিছু উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে, তবে তার প্রভাব মূল্যায়নের জন্য আমাদের আরও অপেক্ষা করতে হবে। কিউবা চীনের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক বাড়িয়ে তুলেছে যার ফলে ভেনেজুয়েলার পর চীন কিউবার সঙ্গে বাণিজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম অংশীদার হয়ে উঠেছে।

১৮। ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হুগো স্যাভেজের মৃত্যু ভেনেজুয়েলার জনগণ ও বলিভারিয়ান বিপ্লবের কাছে এক নতুন চ্যালেঞ্জ রূপে হাজির হয়েছে। কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে স্যাভেজ নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে ১০ শতাংশেরও বেশি ভোট পেয়ে আরও একবার বিপুল বিজয় অর্জন করেন। বিপুল উৎসাহে ভরা ঐ নির্বাচনে ৮০ শতাংশ ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। তিনি ২২টির মধ্যে ২০টি প্রদেশে বিজয়ী হন। তাঁর উত্তরসূরি নিকোলাস মাডুরো মোরোসকে চলতি বছরের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত হতে চলা তীব্র নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হতে হবে (যেটাতে ঘটনাক্রমে তিনি অল্প ব্যবধানে জয়ী হন)। স্যাভেজের প্রথম দফায় শুরু করা আর্থ-সামাজিক সংস্কারের ফল ফলতে শুরু করেছে। এই অঞ্চলে ভেনেজুয়েলাতেই অসাম্যের মাত্রা সবচেয়ে কম এবং দারিদ্র ১৯৯৬-এর ৭০.৮ শতাংশ থেকে কমে ২০১০-এ দাঁড়িয়েছে ২১ শতাংশে। ৭,০০০ ক্লিনিকে কিউবার ৮,৩০০ ডাক্তারদের নিয়ে চালানো প্রাথমিক স্বাস্থ্য-পরিষেবা প্রকল্প ব্যারিও আডেনত্রো ১৪ লক্ষ মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছে। একুশ শতকের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঘোষিত লক্ষ্যকে সামনে রেখে ভেনেজুয়েলার বলিভারিয়ান বিপ্লবী প্রক্রিয়া দেশের অভ্যন্তর থেকেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংস্কার ঘটাতে ও তাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে শুরু করেছে। স্যাভেজের মৃত্যুতে ভেনেজুয়েলার মোড়লতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেশকে অস্থিতিশীল করে তোলার লক্ষ্যে সচেষ্ট হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। স্যাভেজের মৃত্যুতে ওবামা যে বিবৃতি দেন তাতে কোনো শোকজ্ঞাপন ছিল না, উল্টে তিনি তথাকথিত '(ভেনেজুয়েলার) ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়'-এর জন্য ভেনেজুয়েলার জনগণের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনের কথা বলেন। ঐ বিবৃতি সুস্পষ্টভাবেই দেখিয়ে দেয় যে, ২০০২-এর ব্যর্থ সামাজিক অভ্যুত্থানে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলার জনগণের কাছে মুখের মতো জবাব পেয়েছিল, সে এখন অন্য উপায়ে 'জমানা পরিবর্তন' ঘটাতে মরিয়া। তবে, ১৯৯৮-এর পর থেকে গণতন্ত্র গভীরে শিকড় বিস্তারের ফলে ভেনেজুয়েলার জনগণের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ব্যাপকতর মাত্রা অর্জন করেছে এবং তা স্থিতিশীলতাকে বিপর্যস্ত করে তোলার পথে শক্তিশালী প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করছে। উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ৩০,০০০ গণকাউন্সিলে জনসাধারণ এখন নিজেদের স্থানীয় সামাজিক প্রয়োজনগুলো নিয়ে বিতর্ক চালিয়ে সেই অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ করার ক্ষমতা অর্জন করেছেন।

১৯। লাতিন আমেরিকার বামমুখী রূপান্তরণে বলিভিয়া আর একটা গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হয়ে উঠেছে। প্রেসিডেন্ট ইভো মোরালেস ৫৪ শতাংশ ভোট লাভ করে প্রথমবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন ২০০৫ সালে এবং দেশ গণভোটের মাধ্যমে এক নতুন সংবিধান গ্রহণ করার পর ২০০৯ সালে ৬৪ শতাংশ ভোট লাভ করে তিনি পুনর্নির্বাচিত হন। তিনি হলেন দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি স্থানীয় জনজাতিদের মধ্যে থেকে উঠে এসে লাতিন আমেরিকার কোনো দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। স্থানীয় জনজাতিদের আন্দোলন বলিভিয়ায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

২০। লাতিন আমেরিকায় বামেদের পক্ষ থেকে জনগণের ব্যাপকভিত্তিক সমাবেশের চলমান ধারাকে সুনিশ্চিত ও শক্তিশালী করে তুলে ইকুয়েডরের ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট

রাফায়েল কোরি এ বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট পদের নির্বাচনে বিপুল বিজয় অর্জন করেছেন। তাঁর বিজয়কে তিনি উৎসর্গ করেন ভেনেজুয়েলার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুগো স্যাভেজের উদ্দেশ্যে যিনি কয়েক সপ্তাহ ধরে ক্যান্সারের চিকিৎসার পর দেশে ফিরে আসেন এবং 'অত্যন্ত নির্মম নয়া-উদারবাদী বিশ্বায়ন'-এর মোকাবিলার জন্য কোরি লাতিন আমেরিকার আরও বড় ধরনের ঐক্যের আহ্বান জানান। সামাজিক খাতে ব্যয়কে বাড়িয়ে তুলে দারিদ্রকে যথেষ্ট মাত্রায় কমিয়ে আনা এবং অবৈধ ঘোষণা করে বহু কোটি ডলারের বিদেশী ঋণ শোধ না করা ছাড়াও কোরি সরকার মার্কিনের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করে যা প্রতিফলিত হয় ইকুয়েডরে মার্কিন সেনাদের একটি ঘাঁটি ব্যবহারের জন্য অনুমতি না দেওয়া, ইকুয়েডরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের জন্য মার্কিন কূটনীতকদের বহিষ্কার করা এবং লন্ডনে ইকুয়েডরের দূতাবাসে উইকিলিকসের প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জকে রাজনৈতিক আশ্রয় দানের মধ্যে।

২১। লাতিন আমেরিকায় বর্তমানে যে বামমুখী পরিবর্তন চলছে তার শিকড় নিহিত রয়েছে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সমাজতান্ত্রিক সমাবেশের দীর্ঘ ঐতিহ্যের মধ্যে। তবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে বিপদের সম্ভাবনা কিন্তু কমেনি। হন্ডুরাসে ২০০৯-এর জুনে প্রেসিডেন্ট ম্যানুয়েল জেলায়ার বিরুদ্ধে সংঘটিত সামরিক অভ্যুত্থান মার্কিনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন ছাড়া ঘটতে পারত না। জেলায়া ন্যূনতম মজুরি বাড়ানো এবং আলবার সদস্য হওয়ার মতো কিছু কিছু জনমুখী নীতি রূপায়ণ করছিলেন। লাতিন আমেরিকার জনগণ অবশ্য পুরোপুরি সজাগ রয়েছেন। ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সংগঠন, নারী সংগঠন এবং আফ্রিকান-লাতিন আমেরিকান ও জনজাতিদের সামাজিক আন্দোলনগুলো নিজ নিজ দেশের মোড়লতন্ত্রগুলো এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত ও সমাবেশিত হচ্ছে। কোনো কোনো দেশে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা থাকলেও লাতিন আমেরিকার জনগণ এবং বামেদের সামগ্রিক আত্মঘোষণা আরও গতিলাভ করে চলেছে।

২২। ইউরোপের কিছু অংশেও যুব আন্দোলন এবং শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের পুনরুত্থান দেখা যাচ্ছে যা বামেদের পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনাকে জোরালো করছে। এই ঘটনা ঘটছে ইউরো অঞ্চলের তীব্র সংকটের মুখোমুখি হওয়া (ইউরোপীয় ইউনিয়নের ১৭টি দেশ তাদের সাধারণ মুদ্রা হিসাবে ইউরোকে ব্যবহার করলেও তার ১০ সদস্য এখনও নিজেদের মুদ্রাকে বজায় রেখেছে) এবং ইউরো অঞ্চলের যুবকদের মধ্যে বেকারির হার ২২ শতাংশ হওয়া সত্ত্বেও (ইতালি, পর্তুগাল ও শ্লোভাকিয়ায় ৩০ শতাংশের এবং গ্রীস ও স্পেনে ৫০ শতাংশেরও বেশি) সরকারগুলো কঠোর ব্যয়সংকোচের পদক্ষেপ নেওয়ার পটভূমিতে। সাম্প্রতিককালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলোতে ইউরোপে বামেদের মধ্যে সবথেকে ভালো ফল দেখা গেছে গ্রীসে যেখানে সিরিজা (বিপ্লবী বামেদের এক জোট যা এক ডজনেরও বেশি বাম গোষ্ঠী ও ধারাকে নিয়ে গঠিত এবং যা এখন একটা পার্টি হিসাবেই নথিভুক্ত) বিজয়ী দল হয়ে ওঠার কাছাকাছি চলে আসে — তার প্রাপ্ত ভোটের হার ২০০৪-এর (যে বছর প্রথমবার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে) ৩.৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১২-র মে মাসে ১৬.৮ শতাংশ এবং ২০১২-র জুনে ২৬.৯ শতাংশে দাঁড়ায়। ৩০০ সদস্য বিশিষ্ট গ্রীসের সংসদে ৭১ জন সদস্য নিয়ে এই দলটি সেখানে এখন

প্রধান বিরোধী দল। ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি পি সি এফ-ও ২০১২-র প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ১১.১০ শতাংশ ভোট পেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছে, যে হার ১৯৮১-র পর থেকে সবচেয়ে বেশি। ইউরোপের বামেদের বড় অংশ পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইউরোপীয় বাম দল হিসাবে কাজ করছে এবং ২০০৪-এ প্রতিষ্ঠার পর থেকে এরা তিনটি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত করেছে।

২৩। ইতিহাসের দিক থেকে দেখা যায়, তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের পর্যায়গুলোতে চরম দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলোরও উত্থান ঘটেছে — এবং ইউরোপের বামেদেরও কট্টর দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলোর বর্ণবাদী অভিবাসী-বিরোধী ও ইসলাম-বিরোধী রাজনীতির মোকাবিলা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ দেখা গেছে গ্রীসের নির্বাচনে গোল্ডন ডন দলের উত্থান, যা হল এক নয়া-নাজি সংগঠন এবং ৭ শতাংশ ভোট পেয়ে গ্রীসের সংসদে এদের ১৮টি আসন রয়েছে।

২৪। আফ্রিকায় দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যবাদী জমানার অবসানের সাথে সাথে বামেরা এক গুরুত্বপূর্ণ বিজয় অর্জন করেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টি (এস এ সি পি) এখন শাসক আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস (এ এন সি) এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রেড ইউনিয়নগুলোর কংগ্রেস (কোসাটু)-এর সাথে এক ত্রিপাক্ষিক জোটে আবদ্ধ। কিন্তু এস এ সি পি এবং কোসাটুর সাথে আঙ্গিক সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও এ এন সি নেতৃত্বাধীন সরকার নয়া-উদারবাদী নীতির ধারাকে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করছে এবং শ্রমিকদের সংগ্রামের ওপর তীব্র নিপীড়ন নামিয়ে আনছে। জোহানেসবার্গের কাছে মারিকানায় ৩৪ জন প্লাটিনাম খনি শ্রমিকের মর্মান্তিক গণহত্যা বর্ণবৈষম্যবাদী যুগের বর্বরতার স্মৃতিকেই জাগিয়ে তুলেছে। এর ওপর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে এ এন সি সরকার পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে বর্ণবৈষম্যবাদী জমানার এক আইনের আশ্রয় নিয়ে রাষ্ট্রীয় বর্বরতার জন্য সতীর্থ ধর্মঘটী শ্রমিকদের বিরুদ্ধেই মামলা করে। ঐ ঘটনায় ৩৪ জন শ্রমিক নিহত হয় এবং আরও ৭৮ জন গুরুতর রূপে আহত হয়। এস এ সি পি এবং কোসাটু অনুমোদিত খনি শ্রমিকদের জাতীয় ইউনিয়ন ধর্মঘটীদের কালিমালিপ্ত করায় এবং তারা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসা ইউনিয়নে যোগদান করায় দক্ষিণ আফ্রিয়ায় বিপ্লপী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের এক নতুন পর্যায়ের উন্মেষ ঘটছে। প্রকৃত কমিউনিস্টদের সামনে এখন কর্তব্যটা অতএব শুধুই বহুজাতিক সংস্থাগুলো এবং কর্পোরেট-সাম্রাজ্যবাদ চালিত পুনঃঔপনিবেশিকরণের উদ্যোগকে প্রতিরোধ করাই নয়, কমিউনিস্ট সমর্থন নিয়ে চলা সরকারকে প্রতিহত করাও তাদের কর্তব্য হয়ে দেখা দিয়েছে।

২৫। সাম্প্রতিক সময়ে এশিয়ায় জনগণকে সঙ্গে নিয়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সবচেয়ে বড় অগ্রগতি দেখা গিয়েছিল নেপালে যেখানে কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন গণঅভ্যুত্থান রাজতন্ত্রের অবসান ঘটাতে এবং প্রজাতন্ত্রের পথে উত্তরণের প্রক্রিয়ার সূচনা ঘটাতে সফল হয়েছিল। ইতিমধ্যে চারজন প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া এবং সম্ভাব্য সমস্ত ধরনের জোট নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো সত্ত্বেও ২০০৮-এর পর থেকে

সংবিধান রচনার প্রক্রিয়ায় কোনো অগ্রগতি কিন্তু এখনও ঘটেনি। জোট/ঐকমত্যের রাজনীতির জটিলতা ছাড়াও দুটি বিষয় বিশেষভাবে সমস্যাসঙ্কুল হয়ে দেখা দিয়েছে — মাওবাদী সামরিক ক্যাডারদের অন্তর্ভুক্তি ও পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া এবং প্রজাতান্ত্রিক নেপালে যুক্তরাষ্ট্রীয়তার ধরন ও মাত্রা কি হবে তার নিরূপণ। প্রথম বিষয়টির মীমাংসা মোটামুটি হয়ে গেছে, কিন্তু দ্বিতীয় বিষয়টি নিয়ে তীব্র বিতর্ক চলছে, কেননা এতদিন পর্যন্ত বঞ্চিত/প্রতিনিধিত্বহীন অঞ্চলগুলো এবং সামাজিক আত্মপরিচিতি সম্পর্কিত গোষ্ঠীগুলো নতুন ব্যবস্থায় আরও বেশি অধিকারের দাবি জানাচ্ছে। ইতিমধ্যে সমস্ত বড় দলগুলো যখন নতুন করে সংবিধান সভার নির্বাচন তত্ত্বাবধানের জন্য বর্তমান প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে এক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনে সম্মত হয়েছে, তখন নেপালের মাওবাদীদের মধ্যে ভাঙ্গন ঘটে গেছে। আমরা ভারত ও নেপালের মধ্যে উষ্ণ ও সমতাপূর্ণ সম্পর্কের সপক্ষে দাঁড়াই এবং আকাঙ্খা পোষণ করি যে নেপালের জনগণ রাজতন্ত্র-বিরোধী অভ্যুত্থান থেকে প্রাপ্ত সাফল্যগুলোকে সংহত করে আমাদের নেপালী কমরেডদের নেতৃত্বাধীনে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসাবে এগিয়ে যাবেন। ভারতীয় রাষ্ট্র যাতে নেপালে সম্ভাব্য কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করে প্রজাতন্ত্রে উত্তরণে তার প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে বা নেপালের ওপর কোনো ধরনের আধিপত্য কায়েম করতে না পারে তার জন্য আমাদের সতর্ক ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকতে হবে।

২৬। পাকিস্তান অত্যন্ত কঠিন ও উত্তাল সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছে। আফগান সংকট পাকিস্তানকে গ্রাস করেছে এবং সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করে চলেছে এবং প্রাণঘাতী ড্রোন হামলা চালিয়ে পাকিস্তানকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। পাকিস্তানে বিশেষভাবে বালুচিস্তানে শিয়া সম্প্রদায় বিভিন্ন পক্ষের কাছ থেকেই লাগাতার সহিংস আক্রমণের মুখোমুখি হচ্ছে। পাকিস্তানে বিচার ব্যবস্থা অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে — গত বছর সে দুর্নীতির অভিযোগে রাষ্ট্রপতি আসিফ আলি জারদারির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের না করার জন্য আদালত অবমাননার অভিযোগে পাকিস্তান পিপলস পার্টির প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা গিলানিকে বহিষ্কার ও আইনগতভাবে অবৈধ ঘোষণা করে; আর এ বছরের জানুয়ারী মাসে সে দুর্নীতির অভিযোগে ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী রাজা পারভেজ আশরফকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেয়। ইতিমধ্যে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন এগিয়ে আসায় — এবং তা যদি নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত হয় তবে এই প্রথমবারের মতো পাকিস্তানে কোনো নির্বাচিত সরকার পুরো পাঁচ বছরের সময়কাল পূর্ণ করে তার উত্তরসূরীর জন্য পথ প্রশস্ত করবে — কানাডার নাগরিকত্ব নেওয়া পাকিস্তানের এক ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব সহসাই কানাডা থেকে আবির্ভূত হয়েছেন এবং পাকিস্তানকে এক দুর্নীতিমুক্ত মধ্যপন্থী রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাহির-আল-কাদরির এই পরিঘটনাকে কিছু ব্যক্তি ভারতের আন্না হাজারে পরিঘটনার সঙ্গে তুলনা করছেন এবং সামরিক বাহিনীই এটাকে খাড়া করেছে বলে পাকিস্তানে ব্যাপক মানুষ বিশ্বাস করেন। প্রাক্তন ক্রিকেট খেলোয়াড় ইমরান খান পাকিস্তানে এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন, যে ড্রোন হামলা পাকিস্তানি জনগণকে হত্যা করছে

তার বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হয়েছেন, আবার সেনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও এক রহস্যময় সম্পর্ক বজায় রেখেছেন।

২৭। আফগানিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ন্যাটোর সামরিক অভিযান ১১ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলছে। মার্কিন-ন্যাটোর শক্তিগুলো এখন যখন আফগানিস্তান থেকে বেরিয়ে আসার পরিকল্পনার এবং ২০১৪-র মধ্যে সামরিক বাহিনীকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার কথা বলছে, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যেই আফগানিস্তানের সঙ্গে এক স্থায়ী রণনৈতিক অংশীদারিত্বের চুক্তি করেছে, যা মার্কিনকে আফগানিস্তানের ঘাঁটিগুলোতে ঢোকা ও সেগুলোকে ব্যবহারের অনুমতি দেবে এবং ২০১৪-র পরও আফগানিস্তানে মার্কিন সেনাদের রেখে দেওয়ার সম্ভাবনাকেও অনুমোদন করবে। মার্কিনের মিত্র হিসাবে ভারত ইতিমধ্যেই আফগানিস্তানে ভালো মাত্রায় জড়িয়ে পড়েছে। আফগানিস্তানে পশ্চিমের দেশগুলোর হস্তক্ষেপের মাত্রা কমে আসলে তা সম্ভবত আফগানিস্তানকে কেন্দ্র করে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দ্বন্দ্বের জন্ম দেবে। ভারত ও পাকিস্তান ইতিমধ্যেই কাশ্মীর নিয়ে সংঘর্ষের পরিস্থিতিতে জড়িয়ে থাকায়, আফগান ফ্রন্টে দ্বন্দ্বের তীব্রতা বৃদ্ধি ভারত-পাক সম্পর্ককে আরও বিষিয়ে তুলে মার্কিন হস্তক্ষেপকে গভীরতর করবে এবং এইভাবে সমগ্র অঞ্চলকে ক্রমেই আরও বেশি অস্থিতিশীল করে তুলবে। আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে মার্কিন-ন্যাটো সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপের সম্পূর্ণ অবসান এবং দুই দেশের পূর্ণ সার্বভৌমত্ব ও নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেরাই নির্ধারণের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়াই হল এই অঞ্চলে স্থায়ী শান্তির বুনিয়াদী পূর্বশর্ত। আমরা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শান্তি ও মৈত্রীর প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করি এবং ভারতে উগ্র-জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলোর লাগাতার পাক-বিরোধী প্রচারাভিযানের বিরুদ্ধে আমাদের অতন্দ্র প্রহরা জারি রাখতে হবে।

২৮। শ্রীলঙ্কায় রাজাপক্ষে সরকার পুরোদস্তর এক গণহত্যার অভিযানের মধ্যে দিয়ে এল টি টি ই-কে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। ২০১২-র নভেম্বরে প্রকাশিত রাষ্ট্রপুঞ্জের অভ্যন্তরীণ এক তদন্ত রিপোর্টের আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী অসামরিক জনগণের হত্যার সংখ্যা ৭০,০০০ পর্যন্ত হতে পারে, আর বিশ্ব ব্যাঙ্কের জনসংখ্যা সম্পর্কিত তথ্য জানাচ্ছে, ২০০৯-এ এল টি টি ই-র বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অন্তিম যুদ্ধের পর থেকে ১ লক্ষ তামিল জনগণের হদিশ নেই। রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার পর্ষদ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে যাতে যুদ্ধাপরাধের বিষয়টি সম্পর্কে শ্রীলঙ্কাকে বিচার-বিবেচনা করতে বলা হয়। কিন্তু শ্রীলঙ্কা সরকার যে ''গৃহীত শিক্ষা ও সমঝোতা কমিশন'' বসায় তা শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনীকে নিরপরাধ বলে শংসাপত্র দেয়। তাতে বলা হয়, সেনাবাহিনী 'একজনও অসামরিক ব্যক্তিকে হত্যা না করা'র নীতি নিয়েছিল এবং অসামরিক জনগণের মৃত্যুকে 'আনুসঙ্গিক ক্ষয়ক্ষতি' বলেই বিবেচনা করতে হবে। সম্প্রতি যে ফটোগ্রাফিক সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে তা এই দাবিকে সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করেছে। ঐ ছবি থেকে দেখা যাচ্ছে যে প্রভাকরণের নাবালক ছেলেকে শ্রীলঙ্কার সেনারা ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে হত্যা করেছে। সম্প্রতি রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার কমিশন আর একটা প্রস্তাব গ্রহণ করে যা শ্রীলঙ্কা সরকার কর্তৃক গঠিত কমিশনের কার্যকলাপকে স্পষ্টতই পক্ষপাতমূলক ও উগ্রজাতীয়তাবাদী

আখ্যা দেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও তারা প্রায় একটি আন্তর্জাতিক তদন্তের পরামর্শ দেয়, কিন্তু শ্রীলঙ্কা সরকার এই লঘুকৃত প্রস্তাবকেও প্রত্যাখ্যান করে। 'সমঝোতা' সম্পর্কে শ্রীলঙ্কা সরকারের ধারণা শ্রীলঙ্কার তামিলদের সিংহলী উগ্র-জাতীয়তাবাদী কর্তৃত্বকে মেনে নিতে বলে, যদিও শ্রীলঙ্কার তামিলরা এখনও তাদের মধ্যেকার নিহত মানুষদের সংখ্যা গুণে চলেছে। শ্রীলঙ্কায় সমঝোতা শ্রীলঙ্কার তামিল সম্প্রদায়ের বশ্যতার ভিত্তিতে এগিয়ে যেতে পারে না, আন্তর্জাতিক মহলকে এটা সুনিশ্চিত করতে হবে যে, শ্রীলঙ্কার তামিলদের বিরুদ্ধে যে বীভৎস যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত হয়েছিল তার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দোষীদের যেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হয়।

২৯। শ্রীলঙ্কার সাপেক্ষে ভারতের বিদেশনীতি চূড়ান্তভাবেই অসংগতিপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। এক সময়ে এল টি টি ই এবং অন্যান্য ইলমপন্থী গোষ্ঠীগুলোকে সমর্থন করার পথ থেকে ভারত সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করে শান্তি বলবৎ করার নামে শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় সেনাবাহিনী পাঠায়। শ্রীলঙ্কা রাষ্ট্র এল টি টি ই-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে তাকে নিশ্চিহ্ন করলেও ভারত রহস্যময় নীরবতা অবলম্বন করে। আর এখন যুদ্ধাপরাধগুলোর তদন্ত করা, অপরাধীদের শাস্তি প্রদান এবং যুদ্ধ-বিধ্বস্ত শ্রীলঙ্কার তামিলদের ন্যায় বিচারের প্রসঙ্গে ভারত রাষ্ট্রপুঞ্জে মার্কিনের নেওয়া লাইনকেই অনুসরণ করা ছাড়া অন্য কিছু করছে না। ভারতকে একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার প্রতিবাদকে জোরালো করে শ্রীলঙ্কার তামিলদের জন্য ন্যায় বিচারের সপক্ষে আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোকে সমাবেশিত করতে হবে, অন্যদিকে ভারতকে এটাও সুনিশ্চিত করতে হবে যে, এই বিষয়ে তার উদ্যোগ যেন শ্রীলঙ্কার সাধারণ জনগণের বিরুদ্ধে কোনো বৈরী মনোভাবের জন্ম না দেয়। পরিতাপের বিষয় হল, তামিল জনগণের স্বার্থের প্রতিনিধিরূপে নিজেদের জাহির করার ব্যাপারে একে অন্যকে টেক্কা দেওয়ার লক্ষ্যে ডি এম কে এবং এ আই ডি এম কে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক প্রচার চালাচ্ছে, তার মধ্যে এক সিংহলী-বিরোধী সংকীর্ণতাবাদী সুর প্রকট হয়ে উঠছে। দুঃখজনকভাবে তামিলনাড়ুতে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে মারধোর করা হয়েছে এবং শ্রীলঙ্কার খেলোয়াড়দের তামিলনাড়ুতে খেলতে দেওয়া হয়নি। আমরা এই ঘটনাকে এড়িয়ে যেতে পারি না যে, এই দলগুলো এবং কেন্দ্রীয় ও তামিলনাড়ুর সরকার শ্রীলঙ্কার তামিলদের দুর্দশাকে কাজে লাগিয়ে নিতে তৎপর হলেও তামিলনাড়ুতে শ্রীলঙ্কা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের শোচনীয় অবস্থার উন্নতির জন্য তারা কিছুই করছে না।

৩০। পূবের প্রতিবেশী বাংলাদেশ ও মায়ানমারের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভারত সরকার দু-দশক ধরে যে 'পূবের দিকে তাকাও' নীতি অনুসরণ করে চলেছে তা ভারতের বিদেশ নীতির এক গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসাবে দেখা দিয়েছে। এই নীতিকে কাজে লাগিয়ে ভারত যখন আশিয়ানভুক্ত দেশগুলোর কাছে পৌঁছাতে, অধিকতর অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জন করতে এবং বাংলাদেশ ও মায়ানমারে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর আশ্রয় নেওয়াকে বন্ধ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিদ্রোহকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, তখন চীনকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি ও রণনৈতিক লক্ষ্যের সঙ্গে তার সাযুজ্যটাও সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। পূবের প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক মার্কিনের নীতি ও তার অগ্রাধিকারের থেকে স্বাধীনভাবে এবং সমতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার

ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে। যে বাংলাদেশের প্রতিবেশী বলতে গেলে একমাত্র ভারতই (মায়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের সামান্য সীমানাটুকু বাদ দিয়ে), সেই বাংলাদেশের উদ্বেগগুলো সম্পর্কে ভারতকে ইতিবাচকভাবে সাড়া দিতে হবে।

৩১। মায়ানমারে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনকে ভারত গোড়ার দিকে সমর্থন জানালেও পূবের দিকে তাকাও নীতি গ্রহণের পর থেকে সে সেখানকার সামরিক শাসকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে শুরু করে। গণতন্ত্রপন্থী আন্দোলনের নেতা আং সান সু কি-র গৃহবন্দিত্ব থেকে ২০১০ সালে মুক্তির পর তাঁর দলকে পুনরায় নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং ২০১২ সালে যে ছটি আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে তাঁর দল তিনটি আসনে জয়লাভ করে। তবে মায়ানমারের গণতন্ত্র এখনও মজবুত নয় এবং তাতে সামরিক বাহিনীর প্রভাব জোরালো হয়েই থাকছে। ঐ দেশের গণতন্ত্রের সামনে অন্য যে চ্যালেঞ্জটি থেকে যাচ্ছে তা হল, ধর্মীয় ও জনজাতি সম্পর্কিত সংখ্যালঘুদের অধিকারের প্রশ্ন। জনজাতি সম্পর্কিত হিংসার ফলে বাধ্য হয়ে হাজার হাজার রোহিঙ্গিয়া মুসলিম মায়ানমার ছেড়ে পার্শ্ববর্তী থাইল্যান্ড, বাংলাদেশ, ভারত বা মালয়েশিয়ায় আশ্রয় খুঁজছেন। মায়ানমারে নব-নির্বাচিত সরকার রোহিঙ্গিয়াদের অধিকার ও নিরাপত্তার বিষয়ে কোনো দ্ব্যর্থহীন প্রতিশ্রুতি এখনও দেয়নি।

৩২। চার দশক আগে মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবিতে বাংলাদেশে এক শক্তিশালী জনজাগরণ দেখা যাচ্ছে। আজকের পরিস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধের ভাবমানসের পুনরুজ্জীবনের মধ্যে শুধু দক্ষিণপন্থী ও মৌলবাদী শক্তিগুলোকে কার্যকরীভাবে বিচ্ছিন্ন করে তোলার সম্ভাবনাই লুকিয়ে নেই, গোটা বাংলাদেশকে শ্রমিকদের ঘামে ভেজা সস্তা শ্রমের কারখানায় এবং কর্পোরেট লুণ্ঠনের পরীক্ষাগারে পরিণত করতে উদ্যত হওয়া নয়া-উদারবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ জানানোর সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে, রাষ্ট্র ও জামাত-বি এন পি শিবিরের মধ্যেকার ব্যাপক সংঘাত, পুলিশের গুলিতে বহু সংখ্যক মানুষের নিহত হওয়া এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিক ও প্রগতিশীল শক্তিগুলোর ওপর ভয়াবহ আক্রমণের যে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে তার ফলে প্রতিবাদ নিষ্প্রভ হয়ে উঠছে এবং পরিবেশ কলুষিত হয়ে উঠছে। এইভাবে তা ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের ভাবধারার প্রগতিবাদী পুনরুত্থানের আকাঙ্খায় গড়ে ওঠা আন্দোলনের সামনে এক গুরুতর চ্যালেঞ্জও হাজির করছে।

৩৩। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বৃহত্তর আঞ্চলিক সহযোগিতার লক্ষ্যের প্রতি সমর্থন জানানোর পাশাপাশি আমাদের দক্ষিণ এশিয়ার বাম শক্তিগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিকাশ ঘটাতে হবে, সংহতি গড়ে তুলতে হবে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ ও কর্পোরেট লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে চালিত গণআন্দোলনগুলোর সঙ্গে। নেপাল ও বাংলাদেশের কমরেডদের সঙ্গে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক স্তরে মত বিনিময় আমাদের পারস্পরিক বোঝাপড়াকে শক্তিশালী করে তুলেছে। শ্রমজীবী জনগণের আশু ও বুনিয়াদি স্বার্থ ও আশা-আকাঙ্খাগুলোর সপক্ষে দাঁড়ানোর পাশাপাশি পাকিস্তানের বাম আন্দোলনকে

সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত, সেনা নিয়ন্ত্রিত স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং সন্ত্রাসবাদ চালিত বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে একই সাথে সংগ্রাম চালানোর চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে। পাকিস্তানের বাম ও প্রগতিবাদী শক্তিগুলোর এই কঠিন লড়াইয়ে আমরা তাদের সার্বিক সাফল্য কামনা করি। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বামেদের পুনরুত্থানের প্রক্রিয়া ও সম্ভাবনার ব্যাপারে ভারত এবং সারা দক্ষিণ এশিয়ার কমিউনিস্ট আন্দোলনকে পরিপূর্ণ অবদান রাখতে হবে।

জাতীয় পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য

১। ভারত এক উত্তাল সময়ের মধ্য দিয়ে চলেছে। একদিকে দেখা যাচ্ছে নয়া-উদারবাদী নীতির জমানায় ক্রমবর্ধমান সংকট এবং এই সংকটের বোঝা জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্য কর্পোরেট/রাষ্ট্রের মরিয়া আক্রমণ, অন্যদিকে আমরা প্রত্যক্ষ করছি জনগণের ক্রোধের বিপুল বহিঃপ্রকাশ। কর্পোরেটমুখী, জনবিরোধী নীতির আক্রমণ ও তার সঙ্গে যুক্ত রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে। কর্পোরেট জমি লুঠের বিরুদ্ধে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কিংবা যৌন হিংসার প্রতিবাদে অথবা শ্রমিকদের অধিকারের দাবিতে গড়ে ওঠা সংগ্রামে সর্বত্রই জনগণের আত্মঘোষণার উৎসাহব্যঞ্জক প্রাবল্য দৃশ্যমান হয়ে চলেছে। ১৬ ডিসেম্বর গণধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে দিল্লীতে ঐতিহাসিক যুব অভ্যুত্থান মহিলাদের অধিকার রক্ষায় দেশব্যাপী এক নারী জাগরণের সাথে সাথে সামাজিক জাগৃতির সঞ্চার করেছে। ২০-২১ ফেব্রুয়ারী নজিরবিহীন দু-দিনের সর্বভারতীয় ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর জোরালো এক উত্থানকেও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। অর্থনৈতিক দুর্ভোগ ও রাষ্ট্রের নিপীড়নমূলক হামলা সত্ত্বেও বর্তমান সন্ধিক্ষণটি ভারতীয় জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মহৎ সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ।

২। দুই দশকব্যাপী লাগামহীন উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ ও ভুবনীকরণের আর্থিক নীতির নিরবচ্ছিন্ন অনুসরণ ভারতকে এক গভীর অর্থনৈতিক সংকটের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এই সমস্ত বছরগুলোতে শাসকশ্রেণী তাদের নীতিসমূহের ন্যায্যতা বোঝাতে আর্থিক বিকাশের বর্ধিত হারের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে এসেছে। কিন্তু গত এক দশকে আর্থিক বৃদ্ধির হার সর্বনিম্ন স্থানে নেমে আসায় বিকাশের বেলুনটি চুপসে গেছে। কৃষি ও শিল্প উৎপাদন গভীর স্থিতাবস্থার মধ্যে পড়েছে এবং বহু প্রশংসিত পরিষেবা ক্ষেত্রটিও মন্দা কবলিত হতে শুরু করেছে।

৩। আমেরিকা ও অন্যান্য সংকট-আক্রান্ত দেশগুলোর অনুকরণে ভারতীয় শাসকশ্রেণী একদিকে সংকটগ্রস্ত কর্পোরেশনগুলোর জন্য বেল-আউট ঘোষণা করা ও অন্যদিকে ব্যয়-সঙ্কোচের অজুহাতে ও আর্থিক ঘাটতি ঠেকানোর নামে সাধারণ মানুষের ওপর আরও দুর্দশা নামিয়ে আনা — এই দ্বিমুখী কৌশল অবলম্বন করে। দু-দশক আগে মনমোহন সিং ভারতের অর্থনীতিকে উদ্ধার করার নামে নয়া উদারনৈতিক নীতিমালার প্রবর্তন করেন। আর এখন সেই নীতিমালা যখন ভারতকে আরও গভীর পাঁকে নিমজ্জিত করছে তখন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মনমোহন সিং আরও বেপরোয়াভাবে উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ ও ভুবনীকরণের নয়া উদারবাদী কর্মসূচীকে চাপিয়ে দেওয়ার এক সুযোগ হিসাবেই এই সংকটকে কাজে লাগাতে চাইছেন।

৪। বিদেশী পুঁজির ওপর ভারতের নির্ভরতাকে কাটিয়ে তোলার পরিবর্তে এবং বিশ্বপুঁজির আক্রমণ থেকে ভারতীয় অর্থনীতিকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে রক্ষাকবচ খাড়া করার

বদলে ইউ পি এ সরকার অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রকে বিদেশী পুঁজির ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণহীন কার্যকলাপের সামনে বেপরোয়াভাবে উন্মুক্ত করে দিচ্ছে। ব্যাপক বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করে সরকার বহু ব্রান্ডের খুচরো ব্যবসা ও পেনশন তহবিলে এফ ডি আই-কে অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ২০১২-১৩ সালের বাজেটেই সর্বপ্রথম ভারত সেই সমস্ত ফাঁক ফোকরগুলো বন্ধ করার জন্য বিধি প্রবর্তনের কথা (জেনারেল অ্যান্টি অ্যাভয়ডান্স রুলস — কর ফাঁকি রোধক সাধারণ আইন) বলে — যেগুলোর মাধ্যমে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা আইনসিদ্ধভাবে কর এড়িয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে মরিশাস ও কেম্যান দ্বীপপুঞ্জের মতো কর ছাড়ের স্বর্গরাজ্যকে ব্যবহার করে এসেছে। কিন্তু সরকার দ্রুতই তা স্থগিত করে দেয়, প্রথমে এক বছর তারপর তিন বছরের জন্য। আর এই বছরের বাজেটকে কার্যত বিদেশী বিনিয়োগকারীদের প্রতি উৎসর্গ করা হয়েছে — যেখানে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, বিদেশী বিনিয়োগকে স্বাগত জানানো ছাড়া দেশের সামনে আর কোনো পন্থা নেই।

৫। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে কর্পোরেট ক্ষেত্রকে ভর্তুকি দেওয়ার ঘটনাগুলো এদেশে নানা রূপে চলে থাকে। বার্ষিক বাজেটগুলোতে কর্পোরেট ক্ষেত্রের জন্য যেভাবে কর ছাড় দেওয়া হয় তা থেকেই এ প্রশ্নে স্পষ্ট ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হয় এবং গত আটটি বাজেটে এই ছাড়ের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৫ ট্রিলিয়ন টাকার বেশি। এটাও সুবিদিত যে ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোর সব থেকে বড় ঋণগ্রহীতা হল কর্পোরেট সেক্টর এবং ঋণ পরিশোধ না করার দিক থেকেও এদের অংশই সবচেয়ে বেশি। বিশ্বজুড়ে লগ্নি সংকট সত্ত্বেও ব্যাঙ্কগুলো তাদের কর্পোরেট মক্কেলদের প্রচুর ঋণ দিয়ে চলেছে এবং অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এই কর্পোরেট ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩.৬ ট্রিলিয়ন টাকা।

৬ সাম্প্রতিক সময়ের সব থেকে বড় আর্থিক কেলেঙ্কারিগুলো যেমন ২-জি, কোলগেট, কে-জি বেসিন কেলেঙ্কারি (ও এন জি সি দ্বারা কৃষ্ণা-গোদাবরী অববাহিকায় গ্যাস ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয় এবং পরবর্তীতে তা রিলায়েন্স শিল্পগোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়া হয়) ইত্যাদিগুলো হল কর্পোরেটদের স্বার্থে জাতীয় কোষাগারের বিপুল ক্ষতির এক একটা উদাহরণ। কর্পোরেট ক্ষেত্রের প্রতি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা অথবা কর্পোরেট লুণ্ঠনের জন্য রাষ্ট্রের সংযোগ ও সম্মতির নিদর্শন হল নির্লজ্জ কর্পোরেট ঘেঁষা আইনগুলোর প্রণয়ন, যেমন ২০০৫-এর এস ই জেড আইন বা ইউ পি এ মন্ত্রীসভা কর্তৃক অনুমোদিত জমি অধিগ্রহণ বিল অথবা পিপিপি মডেলের সুবিধা করে দেওয়ার জন্য বর্তমান আইন ও সংসদীয় প্রক্রিয়াগুলোতে প্রণালীবদ্ধভাবে অন্তর্ঘাত ঘটানো।

৭। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দুর্নীতির বিস্ময়করভাবে বেড়ে ওঠাকে রাষ্ট্র-কর্পোরেট ক্রমবর্ধমান আঁতাদের পরিণাম বা তাদের অঙ্গাঙ্গী বৈশিষ্ট্য হিসাবেই দেখতে হবে। সি এ জি কর্তৃক উন্মোচিত বিশাল বিশাল কেলেঙ্কারিসমূহ দেখিয়ে দেয় যে দুর্নীতি হল প্রকৃতপক্ষে কর্পোরেটদের জন্য ভর্তুকি বা কর্পোরেট লুণ্ঠনেরই প্রকাশ। আর কর্পোরেট লুটের অর্থই হল দেশের সম্পদকে লুটে নেওয়া ও জনগণের অধিকারগুলো হরণ করার মতো জাতীয় কোষাগারকেও আত্মসাৎ করা। শাসকশ্রেণীগুলো এবং তাদের তত্ত্বকারেরা

যখন উন্নয়নের নামে এই লুণ্ঠনকে আড়াল করতে বা ন্যায়সঙ্গত বলে দেখাতে চায়, তখন দুনিয়াজুড়ে মার্কসবাদী পণ্ডিত ও গণআন্দোলনের শক্তিসমূহ একে পুঁজিবাদী শোষণের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার বাইরে (জনগণের) লুণ্ঠনমূলক পুঁজি সঞ্চয় বলে যথার্থভাবেই চিহ্নিত করেন — যেখানে মুষ্টিমেয়র হাতে প্রভূত সম্পদ জমা হয় আর জনসমষ্টির বিশাল অংশকে নিঃস্ব ও বঞ্চিত করা হয়।

৮। দুর্নীতির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবৃদ্ধিও এক জ্বলন্ত সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে আর এটা সরকারের আর্থিক নীতিমালারই প্রত্যক্ষ পরিণতি। পেট্রোল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের মূল্য বিনিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে এবং সম্প্রতি এখন রেল বাজেটেও যাত্রীভাড়াকে পরিবর্তনশীল জ্বালানির মূল্যের সঙ্গে যুক্ত করার মাধ্যমে বিনিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব করা হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য নাগরিক সুযোগ-সুবিধার মতো মৌলিক পরিষেবাগুলোর ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিকীকরণের সাথে সাথে সমস্ত বুনিয়াদী সামগ্রী ও পরিষেবার মূল্যবৃদ্ধি শ্রমজীবী জনগণের ক্রয়ক্ষমতার ক্রমাগত হ্রাস ঘটিয়ে চলেছে — যার ফলে জনগণ বেশি বেশি করে দারিদ্র ও অনাহারের মধ্যে নিমজ্জিত হচ্ছেন। মূল্যবৃদ্ধিকে প্রতিহত করার জন্য জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ ও গরিবদের জন্য কিছু পরিমাণে কার্যকরী ভর্তুকি প্রদানের পরিবর্তে সরকার মনভোলানো কিছু পরিসংখ্যান হাজির করছে এবং এমনকি হাস্যকরভাবে দারিদ্রসীমাকেই নামিয়ে আনছে। আর এখন সে ভর্তুকিকে আরও ছাঁটাই করার সুপারিশ করছে এবং আরও অল্পসংখ্যক উপভোক্তার কাছে নগদ অর্থে ভর্তুকি দেওয়ার প্রস্তাব করছে। এর ফলে খেটে খাওয়া মানুষের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে বাজারের দয়ার ওপর ছেড়ে দেওয়া হবে।

৯। কর্পোরেট-বাজার হামলার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গণতান্ত্রিক পরিসরকে ক্রমাগত সঙ্কুচিত করে তোলা। কর্পোরেট লুণ্ঠনকে যেমন উন্নয়নের নামে আড়াল করার চেষ্টা হয়ে থাকে, তেমনি গণতন্ত্রের ওপর ধারাবাহিক আক্রমণকে জাতীয় নিরাপত্তার নামে বৈধতা প্রদানের চেষ্টা করা হয়। ভারতীয় রাষ্ট্রের বর্তমান এই জাতীয় নিরাপত্তার তত্ত্ব আসলে 'জাতীয় নিরাপত্তা'র নামে সমগ্র বিশ্বে আধিপত্য কায়েমের লক্ষ্যে আমেরিকার যে তত্ত্ব তাকে এবং 'সন্ত্রাস-বিরোধী যুদ্ধ'-র নামে আমেরিকার মুসলিম বিরোধিতাকে ভারতের মাটিতে প্রসারিত করা ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারতীয় রাষ্ট্র আমেরিকার এই পক্ষপাত ও অগ্রাধিকারগুলোকে দেশের মাটিতে টেনে আনছে এবং একে পাকিস্তান ও চীনের সাথে ভারতের নিজস্ব যে চিরায়ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কাশ্মীর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে বন্দুকের ডগায় চালিত করা ও দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার পক্ষে মাওবাদীদের সব থেকে বড় বিপদ বলে ভাবার যে অভ্যাস তার সঙ্গে যুক্ত করছে। এটি বর্তমানে এক স্বয়ংক্রিয় অবিরাম ক্রিয়াশীল চক্রে পরিণত হয়েছে যেখানে সন্ত্রাসবাদ ও রাষ্ট্রীয় সংস্ত্রাস একে অপরকে শক্তিশালী করে তুলছে।

১০। 'কঠোর রাষ্ট্রের' তত্ত্ব হল আসলে বেসামরিক প্রশাসনে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপকে বেশি বেশি বাড়িয়ে তোলার জন্য ভারতকে পুলিশী রাষ্ট্রে পরিণত করার এক নরম ভাষ্য। শাসকশ্রেণীর সমস্ত বড় দলগুলো বিশেষ করে জাতীয় দলগুলোর মধ্যে

কংগ্রেস ও বিজেপি এবং আঞ্চলিক দলগুলোর মধ্যে শিবসেনা এই তত্ত্বের শরিক। শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন বা জনগণের আন্দোলন মোকাবিলা করতে লাঠিচার্জ, গুলিবর্ষণ ও ব্যাপক গ্রেপ্তার করা হল সরকারের ও পুলিশের বাঁধা পদক্ষেপ। আমেরিকা চালিত 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'-র সঙ্গে নিজেকে জুতে ভারতে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী পদক্ষেপ ইসলাম ফোবিয়ার অজুহাত হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোয়েন্দা সংস্থার দ্বারা ব্যাপক সংখ্যক নিরীহ নাগরিকদের মিথ্যাভাবে অভিযুক্ত করার খবর আরও বেশি বেশি করে প্রকাশ হয়ে পড়লেও সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে হেনস্থামূলক ধরপাকড় অব্যাহত রয়েছে। ক্রমশ বেড়ে ওঠা প্রতিরোধের মুখে 'পোটার' মতো দানবীয় আইনকে সরকার প্রত্যাহার করে নিলেও, আফস্পা, ইউ এ পি এ-র মতো দানবীয় আইন এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশবাদীদের ফেলে যাওয়া রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের দ্বারা গণতন্ত্রকে ধারাবাহিকভাবে পদদলিত করা হচ্ছে। সেনাবাহিনীর পছন্দ নয় — এই কারণ দেখিয়ে আফস্পা আইন বাতিল বা অন্ততপক্ষে সংশোধনের জন্য প্রতিটি পরামর্শকে সরকার নাকচ করছে এবং সেনাবাহিনী বলছে, আফস্পার মতো বিশেষ আইনের রক্ষাকবচ ছাড়া নাগরিক বিক্ষোভকে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। অপারেশন গ্রিন হান্ট ও অনুরূপ দমনমূলক অভিযান চালাতে ও বিনা বিচারে আটক রাখতে ইউ এ পি এ আইনি অস্ত্র যুগিয়েছে এবং রাষ্ট্রদ্রোহ আইন (ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারা) অসন্তোষকে অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করতে এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে হত্যা করতে সুবিধা করে দিয়েছে। সম্প্রতি হায়দ্রাবাদে বিস্ফোরণের সময় আমেরিকার এন সি টি সি-র ধাঁচে ইউ পি এ সরকার পুনরায় ন্যাশনাল কাউন্টার টেররিজম সেন্টার স্থাপনের ভাবনাকে সামনে আনতে সচেষ্ট হয়েছে। ইউ এ পি এ-র স্বেচ্ছাচারী ধারাগুলোর দ্বারা বলীয়ান হয়ে এই ধরনের সংস্থা গোয়েন্দা বিভাগের (আই বি) হাতে অপরিসীম ক্ষমতা জোগাবে এবং এই অর্থে তার আমেরিকান সহযোগী এফ বি আই-কেও মদত জোগাবে এবং কোনো স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা ছাড়াই যে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার ও হয়রানি করা সম্ভব হবে। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত আমেরিকার কোম্পানিগুলো সহ বিভিন্ন কর্পোরেশনের দ্বারা যে ইউনিক আইডেনটিফিকেশন প্রকল্প (ইউ আই ডি) শুরু হয়েছে তা নাগরিকদের ওপর অনধিকারমূলক নজরদারির সুবিধা করে দেবে এবং ভারতীয় ও বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থা এবং কর্পোরেশনগুলোর কাছে স্পর্শকাতর ব্যক্তিগত বিষয় ও তথ্যপঞ্জিকে সহজলভ্য করে তুলবে। ভারতে গণতন্ত্রকে রক্ষা করার প্রশ্নটি আজ এই সমস্ত দানবীয় আইন ও ক্রমবর্ধমান বিচারবিভাগ বহির্ভূত নিপীড়নমূলক পদক্ষেপকে অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছে।

১১। ক্রমেই বেড়ে চলা জনগণের বিরোধিতার মুখে কেলেঙ্কারি-কলঙ্কিত ও সব দিক থেকে নিন্দিত ইউ পি এ সরকার বিজেপিকে তোয়াজ করে সংকট থেকে উদ্ধার পেতে চাইছে। এর সবথেকে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল আফজল গুরুর ফাঁসি — যা অত্যন্ত সঙ্গোপনে, এমনকি তার পরিবারকে কোনো কিছু না জানিয়ে এবং তার ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন খারিজ হওয়ার বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তোলার যথার্থ সুযোগ না দিয়েই সংঘটিত

করা হয়েছে। কাশ্মীরের প্রেক্ষাপটে, কাশ্মীরী নেতা মকবুল বাটের প্রাণদণ্ডের ২৯তম বার্ষিকীর মাত্র দু-দিন আগে সংঘটিত অন্যায়ভাবে এই ফাঁসি দেওয়ার ঘটনা কাশ্মীরী জনগণের বিচ্ছিন্নতাবোধকে অপরিমিতভাবে গভীর করে তুলেছে। ভারতীয় রাজনীতির সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে এই জাতীয় তোষণকে কংগ্রেস কর্তৃক বিজেপির অযোধ্যা অভিযানের কাছে আত্মসমর্পণের সাথেই তুলনা করা যায় — যার ফলে সংঘ পরিবারের বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে সরে পড়তে সুবিধা হয়। কংগ্রেস, বিজেপি ও প্রধান সংবাদ মাধ্যমগুলোর দ্বারা আফজল গুরুর ফাঁসিকে কেন্দ্র করে উৎসবমুখর উন্মত্ততা সৃষ্টির তারস্বর প্রচারকে অগ্রাহ্য করে দেশের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক জনমত সাহসের সঙ্গে এই হত্যাকাণ্ডের অশুভ রাজনৈতিক তাৎপর্যকে উন্মোচিত করেছে। এই ঘটনা সঠিকভাবেই ভারতে মৃত্যুদণ্ডের অবসান ঘটানোর অথবা অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে অন্ততপক্ষে মৃত্যুদণ্ডে স্থগিতাদেশ প্রদানের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের যে প্রস্তাব তাকে মান্যতা প্রদানের দাবিকে জোরদার করে তুলেছে।

১২। কাশ্মীরে সামরিকবাহিনী মোতায়েন ও আফস্পা বহাল রাখাকে যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলতে দীর্ঘদিন ধরেই ভারতীয় রাষ্ট্র জঙ্গী কার্যকলাপকে অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করে চলেছে। ২০০৮ থেকে কিন্তু এই দাবি সম্পূর্ণতই অসার প্রতিপন্ন হয়েছে। ২০০৮-এ অমরনাথ জমি বিতণ্ডা, ২০০৯-এ সোপিয়ান ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড এবং ২০১০-এ 'শোকযাত্রা' ও প্রতিবাদী মিছিলে নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিচালনার ফলে ১১৫ জন প্রতিবাদী নাগরিককে হত্যার বিরোধিতায় সাধারণ কাশ্মীরী জনগণের ধারাবাহিক গণবিক্ষোভের মুখে ভারতীয় রাষ্ট্র ও নিরাপত্তাবাহিনী বারংবার ধিক্কৃত হয়েছে। এইসব বিক্ষোভ কর্মসূচীগুলোতে মহিলা প্রতিবাদকারীদের উপস্থিতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঢিল ছোড়ার অপরাধে যুবকদের কুখ্যাত জন নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গণ-কবরের অস্তিত্বের সমর্থনে নতুন সাক্ষ্য প্রমাণগুলো সেনাবাহিনীর দ্বারা ধৃত ও 'নিখোঁজ' কাশ্মীরী যুবকদের বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডগুলোর দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। ইউ পি এ সরকারের বহু ঢক্কানিনাদিত আলোচনাকারীদের একটি দল প্রেরণের প্রক্রিয়া লোকদেখানো কৌশল ভিন্ন অন্য কোনোভাবেই বিবেচিত হয়নি। কাশ্মীরী ছাত্র-যুবরা সবসময়ই গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর হেনস্থার শিকার হয়ে এসেছে। কিন্তু আফজল গুরুর ফাঁসির পর কাশ্মীরের অভ্যন্তরে সেনাবাহিনীর দ্বারা প্রতিবাদীদের হত্যার ঘটনার পাশাপাশি কাশ্মীরের বাইরেও হিন্দুত্ববাদী গ্রুপগুলোর দ্বারা সংগঠিতভাবে কাশ্মীরী যুবকদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে। তাঁদের এই ক্রোধ ও যন্ত্রণার সময় আমাদের অবশ্যই ক্ষুব্ধ কাশ্মীরী জনগণের পাশে দাঁড়াতে হবে, গণতন্ত্র ও ন্যায়ের দাবিতে তাঁদের সংগ্রামকে সমর্থন করতে হবে এবং আফস্পা প্রত্যাহার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য তাঁদের ন্যায়সঙ্গত আকাঙ্খাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানাতে হবে।

১৩। শাসকশ্রেণী দেশকে এক সর্বব্যাপী সংকটের দিকে ঠেলে দেওয়ার এবং সাধারণ জনগণের জীবিকা ও অধিকারের বিরুদ্ধে কার্যত এক যুদ্ধ ঘোষণা করায় জনগণও সর্বত্র সরকারগুলো ও তাদের নীতিমালার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে উঠে দাঁড়াচ্ছেন।

এ যাবৎকাল পর্যন্ত ভারতের ইতিহাসে সর্বাধিক কেলেঙ্কারি-কলঙ্কিত শাসক হিসাবে কংগ্রেস দ্রুতই তার জমি হারাচ্ছে। বিজেপিও সমভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে উন্মোচিত হচ্ছে এবং ফলত কংগ্রেসের যা ক্ষতি তা বিজেপির লাভে হুবহু রূপান্তরিত হচ্ছে না। তথাপি, যে সমস্ত রাজ্যে কোনো তৃতীয় শক্তির বড়সড় অস্তিত্ব নেই এবং নির্বাচনী রাজনীতি মূলত কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে ঘোরাফেরা করে সেখানে হয় বিজেপি ক্ষমতা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে (বিশেষ করে গুজরাটে) অথবা ভাবমূর্তির ক্ষয় হতে থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছে (সাম্প্রতিক নির্বাচনে উত্তরাখণ্ড ও হিমাচলপ্রদেশে যা দেখা গেছে)।

১৪। কর্ণাটক হল এমন এক রাজ্য যেখানে বিগত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ও কংগ্রেস তৃতীয় দল ডে জি (এস)-কে সঙ্কুচিত করে দিয়ে উভয়েই লাভবান হয়েছে। ২০০৪-এ বিজেপি সেখানে একক বৃহত্তম দল হিসাবে সামনে আসে এবং চার বছর পর, দক্ষিণ ভারতে কর্ণাটকই হল প্রথম সেই রাজ্য যেখানে বিজেপি সরকার গঠন করে। কিন্তু বিজেপির শাসন ব্যাপক জমি ও খনি কেলেঙ্কারি এবং খনি-মাফিয়াদের উত্থান এবং মহিলা ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিশেষত খ্রিস্টানদের ওপর আক্রমণের জন্য কুখ্যাত হয়ে ওঠে। দুর্নীতির দায়ে কর্ণাটক লোকায়ুক্তের দ্বারা অভিযুক্ত হওয়ায় বিজেপির কঠিন মানব ইয়েদুরাপ্পাকে ২০১১-তে পদত্যাগ করতে হয় এবং পরবর্তীতে পার্টিতে বারংবার বিদ্রোহ দেখা দেওয়ায় তাকে বিজেপি ছাড়তে হয় এবং নিজস্ব দল গঠন করতে হয়। এখন দেখার ইয়েদুরাপ্পাকে বহিষ্কারের ধাক্কা বিজেপি সামলাতে পারে কিনা। অনেক দিক থেকেই কংগ্রেস শাসিত অন্ধ্রপ্রদেশ এখন বিজেপি শাসিত কর্ণাটকেরই প্রতিচ্ছবি হিসাবে সামনে এসেছে। কাগজে-কলমে কংগ্রেস এখনও সেখানে ক্ষমতায়, যদিও কংগ্রেস ভেঙ্গে বেরিয়ে আসা ওয়াই এস আর কংগ্রেসই সেখানকার আসল কংগ্রেস বলে প্রতিভাত হচ্ছে আর চিত্রতারকা চিরঞ্জীবির নেতৃত্বাধীন পূর্বতন প্রজা রাজ্যম পার্টিকে হাত করে নেওয়ার মাধ্যমে কংগ্রেস ক্ষতিপূরণের ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছে এবং কংগ্রেসের সঙ্গে তেলেঙ্গানা রাষ্ট্রীয় সমিতির মিলে যাওয়ার সম্ভাবনাকে খতিয়ে দেখছে।

১৫। কর্ণাটক ছাড়া অন্য যে রাজ্যে সাম্প্রতিককালে বিজেপি তার শক্তিবৃদ্ধি করতে ও গুরুত্ব আদায় করতে সক্ষম হয়েছে সেটি হল বিহার। প্রকৃতপক্ষে ২০০৫-এর নভেম্বর থেকে ২০১০-এর নভেম্বরের মধ্যে বিহার বিধানসভায় বিজেপি তার শক্তিকে প্রায় দ্বিগুণ করতে সক্ষম হয়, আসন সংখ্যা ৫৫ থেকে ৯১-এ বৃদ্ধি ঘটায় ও তার সহযোগী জে ডি (ইউ) থেকে মাত্র ২৪টি কম আসন পায়। আর জে ডি-র অপশাসন যদি বিহারে শক্তিবৃদ্ধি ঘটাতে ও নিজেকে ক্ষমতায় আনতে বিজেপিকে সক্ষম করে তোলে তাহলে নীতীশ কুমারের সঙ্গে জোট গড়ে তোলাটাই তাকে বিহারের বুকে তার সম্প্রসারণ ঘটাতে ও প্রভাবকে শক্তিশালী করতে সবথেকে বড় সহায়তা প্রদান করেছে। নীতীশ কুমার তার ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তি ধরে রাখার জন্য নরেন্দ্র মোদির থেকে নিজেকে পৃথক দেখানোর জন্য চেষ্টা চালাচ্ছেন কিন্তু বিহারে নিজের সাম্প্রদায়িক তাস খেলার জন্য বিজেপি খোলা ময়দানই পেয়ে গেছে। ভূমিসংস্কার সম্পর্কিত বন্দ্যোপাধ্যায় কমিশনের

রিপোর্টকে প্রথম সুযোগেই আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেওয়ার মাধ্যমে সামন্ত লবির কাছে নীতীশ জমানার সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং রণবীর সেনাকে লাগাতার তোয়াজ করার কারণে বিজেপি আরও সাহসী হয়ে উঠেছে। বিপরীতে তার চিরায়ত ঘাঁটি যে ঝাড়খণ্ড সেখানে বিজেপিকে তার দল ভেঙ্গে গঠিত ঝাড়খণ্ড বিকাশ মোর্চা ও আন্যান্য আঞ্চলিক শক্তির শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়তে হচ্ছে।

১৬। ভারতীয় রাজনীতিতে আঞ্চলিক দলগুলো উত্তরোত্তর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এদের মধ্যে কয়েকটি দলের যেমন শক্তিশালী আঞ্চলিক বা সামাজিক পরিচিতির মধ্যে বা আলাদা রাজ্যের অথবা স্বায়ত্ত শাসনের দাবিতে দীর্ঘকালীন আন্দোলনের মধ্যে মূল নিহিত রয়েছে, কতকগুলো আবার সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কংগ্রেস অথবা বিজেপির ভাঙ্গনের ফলে বা পূর্বতন জনতা দলের ভাঙ্গনের কারণে উদ্ভুত হয়েছে। গত দুই দশকে ব্যাঙের ছাতার মতো আঞ্চলিক দলের সৃষ্টি ও শক্তিবৃদ্ধিকে অবশ্যই প্রধানত উদারীকরণ ও বেসরকারীকরণ নীতির জমানায় রাজনৈতিক সংঘাত হিসাবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলোতে বৃহৎ কর্পোরেট ঘরানা ও বিশ্বপুঁজির শক্ত ঘাঁটি স্থাপনের প্রচেষ্টার প্রেক্ষিতে শক্তিশালী আঞ্চলিক অর্থনৈতিক স্বার্থের উদ্ভব হিসাবে দেখতে হবে। রাজ্যগুলোতে আঞ্চলিক দলসমূহ কংগ্রেস ও বিজেপিকে কঠিন প্রতিযোগিতার মুখে দাঁড় করিয়ে দিলেও, সর্বভারতীয় রাজনীতিতে তারা কেন্দ্রের সাথে শক্ত দরকষাকষির মাধ্যমে আঞ্চলিক কিছু সুবিধা আদায়ের বিনিময়ে সহযোগীর ভূমিকা পালন করে। শক্তিশালী আঞ্চলিক দলগুলোর মোকাবিলায় ইউ পি এ সরকার গাজর ও লাঠির কৌশল নিয়ে থাকে এবং সি বি আই-এর মতো কেন্দ্রীয় সংস্থা ও (রাজ্যের চাহিদার মুখে) কেন্দ্রের আর্থিক ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে থাকে। খুচরো ব্যবসায় প্রত্যক্ষ পুঁজি বিনিয়োগের প্রশ্নে আর একবার আমরা এস পি এবং বি এস পি-কে ইউ পি এ-র ত্রাণকর্তার ভূমিকায় দাঁড়াতে দেখেছি। অন্যদিকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় জে ডি (ইউ) এবং শিবসেনার মতো এন ডি এ শরিকদের কংগ্রেস প্রার্থীর স্বপক্ষে ভোট দিতে দেখেছি। ইত্যবসরে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিটিতে (ইউ এন এইচ আর সি) শ্রীলঙ্কায় যুদ্ধ-অপরাধের বিষয়ে এবং শ্রীলঙ্কার তামিলদের প্রতি ন্যায়বিচারের জন্য জোরালো প্রস্তাব আনতে ইউ পি এ সরকারের আপত্তি ও ব্যর্থতার প্রশ্নে ডি এম কে (ইউ পি এ সরকার থেকে) সমর্থন প্রত্যাহার করার সাথে সাথেই ডি এম কে নেতাদের সি বি আই তল্লাশির মুখোমুখি হতে হয়েছে।

১৭। সি পি আই (এম) নেতৃত্বাধীন বাম শিবির তাদের সর্বাধিক শক্তিশালী দুর্গ পশ্চিমবঙ্গে বড় বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে। তাদের অপর দুই শক্ত ঘাঁটি কেরল ও ত্রিপুরায় তারা মোটের ওপর শক্তিকে ধরে রাখতে সক্ষম হলেও কেরলে তারা সামান্য ব্যবধানে হেরে ক্ষমতা ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে ও ত্রিপুরায় উপর্যুপরি পঞ্চমবার ক্ষমতায় এসেছে। পশ্চিমবঙ্গে দলের ক্ষয়ের কারণে জাতীয় ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব যথেষ্টই দুর্বল হয়েছে এবং সি পি আই (এম) ও তার সহযোগীদের শক্তি ২০০১-এ যেখানে ৬০-এর অধিক ছিল তা মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়ে ২৪-এ দাঁড়িয়েছে। এ সত্ত্বেও প্রবাদের

উটপাখির মতো সি পি আই (এম) পশ্চিমবঙ্গে তার বিপর্যয়ের প্রকৃত করাণ অনুসন্ধান করা তো দূরস্থান, বিপর্যয়কে মেনে নিতেই অস্বীকার করেছে। পশ্চিমবঙ্গের বাস্তবতার সঙ্গে পরিচিত সকলেই যেখানে এ জন্য সি পি আই (এম)-এর নয়া-উদারবাদী কর্মসূচীকে আঁকড়ে ধরা ও কার্যকর করা এবং ক্রমাগত ঔদ্ধত্যকে দায়ী করছেন, সি পি আই (এম) তখন এটিকে মুখ্যত ইন্দো-মার্কিন পরমাণু চুক্তির মুখে ইউ পি এ সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের বিলম্বিত সিদ্ধান্তের ফলে রাজনৈতিক শক্তির পুনর্বিন্যাসের পরিণাম হিসাবে বর্ণনা করছে। যদিও সি পি আই (এম) বিরোধী ভূমিকা পালনের জায়গায় ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে তা সত্ত্বেও দল জাতীয় ক্ষেত্রে ও সবিশেষ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কংগ্রেস সম্পর্কে নরম মনোভাব গ্রহণ করছে এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীকে ভোটদানের মাধ্যমে তার দীর্ঘদিনের মিত্র সি পি আই এবং আর এস পি-র সঙ্গে সম্পর্ককে ভাঙ্গার পর্যায়ে নিয়ে গেছে।

১৮। পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই (এম)-এর নিদারুণ পরাজয়ে বুর্জোয়া চিন্তাবিদ ও কর্পোরেট সংবাদ মাধ্যম বাম বিরোধী প্রচারকে বাড়িয়ে তুলতে উৎসাহবোধ করছে। এটি বাম শিবিরের অভ্যন্তরেও যথেষ্ট বিতর্ক সৃষ্টি করেছে ও নতুন করে ভাবার ক্ষেত্রে সাহস জুগিয়েছে যদিও সরকারীভাবে সি পি আই (এম) আত্মানুসন্ধানে ও কোনোরকম শিক্ষা গ্রহণে রাজি নয়। বাম বিরোধী প্রচারাভিযানের মোকাবিলা এবং তৃণমূল শাসনে বাম কর্মীবাহিনী ও নেতৃত্বের ওপর নামিয়ে আনা শারীরিক নিগ্রহ এবং রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরোধিতা করার সাথে সাথে আমাদের অবশ্যই সি পি আই (এম)-এর সুবিধাবাদী লাইনের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে তীব্রতর করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে সাম্প্রতিক দুটি ঘটনা — কেরলে প্রাক্তন সি পি আই (এম) কর্মী ও বিপ্লবী মার্কসবাদী পার্টির নেতা কমরেড টি পি চন্দ্রশেখরণকে হত্যা ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রণব মুখার্জীকে সমর্থন জানানো — সি পি আই (এম) নেতৃত্বের সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে জোরদার করার দাবি জানাচ্ছে। ঘটনাক্রমে পশ্চিমবঙ্গ মাওবাদীদের দেউলিয়াপনাকেও উদ্ঘাটিত করে দিয়েছে — যারা তৃণমূলের ক্ষমতায় আসার প্রচেষ্টায় নিজেদের ব্যবহৃত হতে দিয়ে নিষ্ঠুর পরিণাম ভোগ করছেন। ক্ষমতায় আসার আগে মমতা ব্যানার্জী অন্ধ্রপ্রদেশে মাওবাদী নেতা আজাদ হত্যার বিচারবিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছিলেন এবং রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আর এখন তাঁর সরকার মাওবাদী নেতা কিষেণজীকে একই কায়দায় হত্যা করেছে এবং কারাগারে যন্ত্রণাবিদ্ধ প্রায় ৫০০ রাজনৈতিক বন্দির একজনকেও মুক্তি দিতে অস্বীকার করছে। সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ সংগ্রাম এবং তৃণমূলের জনমোহিনী মুখোশের আড়ালে তার ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ববাদী চরিত্রের বিরুদ্ধে সাহসী প্রতিরোধ গড়ে তোলাই হল পশ্চিমবঙ্গে বাম আন্দোলনের পুনরুজ্জীবনের চাবিকাঠি।

১৯। লোকসভা নির্বাচন ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে আমরা বিজেপির মধ্যে নরেন্দ্র মোদিকে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে তুলে ধরার তীব্র শোরগোল প্রত্যক্ষ করছি। মোদি কর্পোরেট মহলেরও যথেষ্ট প্রিয়পাত্র — যারা কর্পোরেটদের অবাধ স্বাধীনতার

গুজরাট মডেলকে এক সর্বভারতীয় রূপ দেওয়ার জন্য আশাবাদী। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোও মোদির প্রতি মনোভাবে বদল ঘটিয়ে চলেছে। পূর্বে তারা সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী প্রচারাভিযানের প্রেক্ষিতে মোদিকে ভিসা প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। আর এখন তারা তার প্রতি নতুন অবস্থান গ্রহণ করছে। ব্রিটিশ হাইকমিশনার গুজরাট সফর করেছেন এবং মোদির সাথে সাক্ষাত করেছেন। আর মার্কিন সেনেটের এক প্রতিনিধিদল গুজরাট ভ্রমণ করেছেন — যা আসলে গুজরাট সরকারের আতিথেয়তায় এক কর্মসূচী বলেই প্রমাণিত হয়েছে। অপরদিকে কংগ্রেস মোদি বিরোধী এক বড় আকারের মেরুকরণ থেকে ফয়দা তুলতে আশাবাদী এবং প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে মোদিকে তুলে ধরার প্রশ্নে এন ডি এ-র মধ্যে ভাঙ্গনের জন্য অপেক্ষারত। এর সাথে সাথে তারা প্রথম ইউ পি এ সরকার থেকে চলে যাওয়া মিত্রদের সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তনের বিষয়টিও প্রত্যাশা করছে। আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে মোদির স্বপক্ষে যে প্রচার তার বিরোধিতা করার সাথে সাথে সুস্পষ্টভাবে বুঝে নিতে হবে যে মোদি আজ আর শুধুমাত্র আগ্রাসী সাম্প্রদায়িকতার প্রতীক নয়, সে এক পুলিশী রাজ্যে বল্গাহীন কর্পোরেট শাসনেরও প্রতিভু। বাস্তবে মার্কিন পরিচালিত ইসলাম বিরোধী অভিযানকালে সাম্প্রদায়িকতাবাদ নিজেই এক নতুন মাত্রা লাভ করেছে। যে নিরাপত্তাহীনতা বোধ কোনোদিনই ভারতে মুসলিমদের মন থেকে মুছে যায়নি এবং ১৯৮০-র দশকে সংঘ পরিবার কর্তৃক রাম জন্মভূমির নামে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে সমাবেশিত করার মারমুখী অভিযান চালানোর সময় যা দারুণ তীব্রতা লাভ করে তা এখন যথার্থই মুসলিমদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় মদতপুষ্ট ধরপাকড় অভিযানের ফলে আরও জোরদার হচ্ছে। এটা ঘটছে বিজেপি-এন ডি এ শাসিত, কংগ্রেস-ইউ পি এ শাসিত বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ পার্টি শাসিত রাজ্য সর্বত্রই। মোদির নেতৃত্বাধীন গুজরাট ২০০২-এ কেবলমাত্র যে ভয়াবহ গণহত্যাকেই প্রত্যক্ষ করেছে তাই নয়, সেখানে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার নামে সংঘর্ষে মৃত্যুর বহু ঘটনাও সংঘটিত হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য সংগ্রামকে যে গণতন্ত্রের জন্য বৃহত্তর সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ করে তুলতে হবে — এই সত্যকে উপলব্ধি করাটা তাই এখন আগের যে কোনো সময়ের থেকে আরও জরুরি হয়ে পড়েছে। সাচার কমিটির সুপারিশগুলোও একথা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী বা ধর্মনিরপেক্ষতার সপক্ষে বাক্যালংকারগুলো প্রায়শ মুসলিম সম্প্রদায়ের ধারাবাহিকভাবে প্রান্তিকীকরণ ও প্রবঞ্চনার হাত ধরেই চলতে থাকে। তথাপি ইউ পি এ সরকার ও অধিকাংশ রাজ্য সরকার — যার মধ্যে অবিজেপি পার্টিগুলো দ্বারা পরিচালিত সেই সমস্ত সরকারগুলোও অন্তর্ভুক্ত যারা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে শপথ নিয়ে থাকে — সাচার কমিটি ও রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশনের সুপারিশগুলোকে প্রয়োগে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে লাগাতার অনীহা দেখিয়ে চলেছে। এই সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের জন্য আমাদের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালানো প্রয়োজন।

২০। আমরা যখন বুঝতে পারছি যে মোদির ক্ষমতা নিছক সংঘ পরিবারের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি থেকে উদ্ভুত নয়, পরন্তু সেটা কর্পোরেট জগতের — যারা লাগামছাড়া ক্ষমতা ও লুণ্ঠনের জন্য ক্ষুধার্ত — দ্বারা মদতপুষ্ট, তখন এটা বোঝাও

সম্ভব যে মোদি মডেলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কেবল সাম্প্রদায়িক বনাম ধর্মনিরপেক্ষ — এই চৌহদ্দির মধ্যে ঘোরাফেরা করতে পারে না, বরং তাকে গণতন্ত্রের জন্য সামগ্রিক সংগ্রাম ও শ্রমজীবী মানুষের কর্পোরেট বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রাম থেকে শক্তি আহরণ করতে হবে। সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস, কর্পোরেট পুঁজি ও রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অংশ হিসাবে মুসলিমদের অপরাধী বানানোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম — এককথায় মোদি মার্কা রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য সমস্ত বিষয়গুলোকে ঘিরে লড়াই চালিয়েই মোদি মডেলের কার্যকরীভাবে মোকাবিলা করতে হবে। কেবলমাত্র জনগণের উচ্চমাত্রার সক্রিয়তা এবং বাম ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির বলিষ্ঠ হস্তক্ষেপই দেশকে কর্পোরেট-ফ্যাসিবাদীদের দ্বারা কব্জা হয়ে যাওয়ার বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে।

২১। সংঘ পরিবার যে তার অস্ত্রসম্ভারকে গণসাম্প্রদায়িক রাজনীতি থেকে গোপন সন্ত্রাসবাদী হামলা পর্যন্ত বিস্তৃত করেছে তার যথেষ্ট ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়। হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সেনাবাহিনীর প্রাক্তন সদস্যদের উপস্থিতি দেশের প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরে সংঘের অনুপ্রবেশ এবং অন্তর্ঘাত সৃষ্টির প্রশ্নটিকেই তুলে ধরে। তার প্রতারণাপূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের কারণে সংঘের সন্ত্রাসবাদ অন্যান্য ধরনের সন্ত্রাসবাদের থেকে পৃথক চরিত্রের। সাধারণত সন্ত্রাসবাদীরা নিজেদের আক্রমণের দায় ঘোষণা করে থাকে, কিন্তু সংঘের চেষ্টা থাকে নিজেদের আক্রমণের দায়ভার মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর চাপিয়ে দেওয়া। এই কৌশল সাম্প্রদায়িক ভাবাবেগকে উৎসাহিত করে — যা থেকে বিজেপি রাজনৈতিক ফয়দা উঠিয়ে থাকে। সন্ত্রাসবাদকে ধর্মীয় আখ্যার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে — যেমন মুসলিম (ইসলামিক) সন্ত্রাসবাদ ও হিন্দু সন্ত্রাসবাদ বলে অভিহিত করে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উভয়কেই সমান বিভ্রান্তিকর বলে প্রথমে এক দায়িত্বজ্ঞানহীন বিবৃতি দিলেন। পরে সম্পূর্ণত আত্মসমর্পণ করলেন এবং সংঘ-বিজেপির সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের কোনো সংযোগ নেই বলে তাদের কার্যত নির্দোষ ছাড়পত্র দিলেন। গৈরিক সন্ত্রাসের যাবতীয় শাখা-প্রশাখার ও তার রাজনৈতিক যোগাযোগের অনুপুঙ্খ তদন্তের দাবিতে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোকে অবশ্যই সরব হতে হবে। সংকীর্ণ হিংসা ও অনৈক্যের ঘটনাগুলোকে সুবিধামতো বেছে নেওয়ার ও তাকে সাধারণীকৃত সাম্প্রদায়িক প্রচারাভিযানে পরিণত করার উদ্দেশ্যে বিজেপির যে অশুভ কৌশল তাকে আমাদের অত্যন্ত জোরের সঙ্গে প্রতিহত করতে হবে। সম্প্রতি আসামের কোকরাঝাড় হিংসার ঘটনায় এবং তার পরবর্তীতে বিদ্বেষ ছড়ানো এস এম এস প্রচারের মধ্য দিয়ে বড় মাত্রায় সাম্প্রদায়িক অনৈক্য ও বিভাজন সৃষ্টি এই অশুভ কৌশলের এক নজির।

২২। কর্পোরেট-ফ্যাসিবাদী আক্রমণকে প্রতিহত করার এবং কংগ্রেস ও বিজেপির বিরোধিতার কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক কর্তব্যটিকে রাজ্যের নির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্যবস্তু ও অগ্রাধিকারের সঙ্গে অবশ্যই সমন্বিত করতে হবে যা বিভিন্ন রাজ্যের বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিস্থিতি ও নির্দিষ্ট বাস্তবতার ওপর নির্ভর করে। অধিকাংশ রাজ্য সরকারই হয় বিজেপি/এন ডি এ অথবা কংগ্রেস/ইউ পি এ জোট দ্বারা পরিচালিত — যে দুই জোট জাতীয় ক্ষেত্রে আমাদের

সংগ্রামের লক্ষ্যবস্তু হয়ে থাকছে। অনেক রাজ্য সরকার এই দুই জোটের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয় এমন সব দল দ্বারা চালিত — উদাহরণস্বরূপ পশ্চিমবাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস, উড়িষ্যায় বিজেডি, উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টি বা তামিলনাড়ুতে এ আই এ ডি এম কে — তাদেরও একইরকম জনবিরোধী, গণতন্ত্র বিরোধী ভূমিকা রয়েছে এবং আমাদের অবশ্যই সেগুলোর জোরদার বিরোধিতা করতে হবে।

২৩। জনবিরোধী, কর্পোরেটমুখী সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা নীতিসমূহের বিরোধিতায় গণসংগ্রাম ও শ্রেণী সংগ্রামকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে এবং সামাজিক নিপীড়ন ও রাষ্ট্রীয় নির্যাতন ও সামন্ত/পিতৃতান্ত্রিক শক্তিগুলোকে প্রতিহত করতে অন্যান্য সংগ্রামী শক্তির সাথে লড়াকু ঐক্যকে আমাদের আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। এই প্রেক্ষিতে সারা ভারত বাম সমন্বয় গঠন এক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রণী পদক্ষেপ। এ আই এল সি এক সাধারণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, কৌশলগত বোঝাপড়া ও সাধারণ এ্যাজেন্ডার ভিত্তিতে কয়েকটি বাম সংগঠনকে এক মঞ্চে এনেছে। এদের মধ্যে কর্মসূচী ও কৌশলগত বিতর্কের মধ্য দিয়ে সি পি আই (এম) থেকে বেরিয়ে আসা সংগঠনগুলোও রয়েছে। এ আই এল সি-কে শক্তিশালী করার সাথে সাথে আমাদের অবশ্যই অন্যান্য বাম শক্তিগুলোর কাছে পৌঁছানোর প্রচেষ্টাকেও অব্যাহত রাখতে হবে এবং তাদের সাথে রাজনৈতিক সহযোগিতা ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সম্ভাবনাগুলোকে খতিয়ে দেখতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই (এম) বিরোধীপক্ষের ভূমিকা গ্রহণ করায়, সাথে সাথে জাতীয় রাজনীতিতেও বিরোধীপক্ষ হওয়ায় বস্তুগতভাবে ইস্যুভিত্তিক বৃহত্তর বাম ঐক্যের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে সি পি আই (এম)-এর নতুন করে কৌশলগত ঘনিষ্ঠতা, বিশেষত সাম্প্রতিক কংগ্রেস-তৃণমূল ভাঙ্গনের পর্যায়ে এবং বাম ঐক্যের থেকেও বুর্জোয়া দলগুলোর সঙ্গে সি পি আই (এম) / সি পি আই-এর নৈকট্য গড়ে তোলার অভ্যাস এ প্রশ্নে বড় প্রতিবন্ধকতা হয়ে থাকছে।

২৪। প্রায় সমস্ত বুর্জোয়া দল এবং তাদের সরকারগুলো যখন নীতির প্রশ্নে কার্যত সহমত পোষণ করছে তখন বেশ একপ্রস্থ বিষয়ে গণপ্রতিবাদগুলো যেভাবে শক্তি সঞ্চয় করছে তা যথেষ্ট উৎসাহজনক। সাম্প্রতিক কয়েকটি আন্দোলন, যেমন উড়িষ্যায় পসকোর জন্য কিংবা ঝাড়খণ্ডের নাগরিতে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের প্রতিরোধ, জইতাপুর ও কুড়ানকুলামে পরমাণু কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, তামিলনাড়ুর পরমাকুড়িতে পুলিশের গুলিচালনায় ৭ জন দলিত শ্রমজীবীর মৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, বিহারের বাথানিটোলা গণহত্যা সংগঠিতকারী অপরাধীদের মুক্তিদান ও ধরমপুরীতে দলিত গণহত্যার প্রতিবাদ, হরিয়ানায় দলিত মহিলাদের ধর্ষণের বিরুদ্ধে এবং গুরগাঁও-এ মারুতি শ্রমিকদের সংগ্রাম দেশজুড়ে গণতান্ত্রিক জনমতকে আলোড়িত করেছে। বর্তমান সন্ধিক্ষণে এই জাতীয় সমস্ত সংগ্রামগুলোকে সম্ভাব্য সবরকম উপায়ে সংগঠিত ও শক্তিশালী করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যকর্ম। মানবাধিকার আন্দোলন ও বিভিন্ন প্রশ্নে নাগরিক সক্রিয়তা এক ক্রমবর্ধমান প্রবণতা। এইসব আন্দোলনের মধ্যে থাকা অনেক এন জি ও-র সংকীর্ণ ও ঘোষিত অরাজনৈতিক বা রাজনীতি বিরোধী কাঠামোর থেকে

নিজেদের পার্থক্যরেখা টানার সাথে সাথে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দাবি ও নাগরিক আন্দোলনকে স্বাগত জানানো ও সমর্থন করার ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই কোনো দ্বিধা থাকলে চলবে না।

২৫। (পৃথক) রাজ্যের দাবিসমূহের নিষ্পত্তি না হওয়ার ফলেও শক্তিশালী গণআন্দোলনের জন্ম হচ্ছে। তেলেঙ্গানা রাজ্যের দাবিতে আন্দোলনে ছাত্র-যুবদের বিপুল অংশগ্রহণ ঘটছে। জনপ্রিয় অভ্যুত্থানের মুখোমুখি হয়ে ইউ পি এ সরকার তেলেঙ্গানা রাজ্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল — যদিও শেষপর্যন্ত তারা সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্যের ইস্যুতে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট বিচারপতি শ্রীকৃষ্ণ কমিটির রিপোর্টে সমস্ত পথই খোলা রাখা হয়েছে। বছরের পর বছর পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের পাহাড় অঞ্চলে দুটি রাজ্য গঠনের দাবি অমীমাংসিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। পূর্বতন দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিলের বদলে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পক্ষে ত্রিপাক্ষিক চুক্তিও গোর্খা জনগণকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি এবং গোর্খা জনগণের পরিচিতির সংকট নিরসনের জন্য গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের দাবি গোর্খা জনগণের মধ্যে যথেষ্ট সজীব হয়ে রয়েছে। আমরা ১৯৯০-এর দশকে গোর্খাল্যান্ড প্রশ্নে সি পি আই (এম) ছেড়ে বেরিয়ে আসা সি পি আর এম-কে — যে সংগঠন এখন এ আই এল সি-র শরিক — সমর্থন করি। সি পি আর এম এক পৃথক গোর্খাল্যান্ডের দাবির মধ্যেও দার্জিলিং পাহাড়ে লালঝাণ্ডাকে উড্ডীন রাখতে সচেষ্ট রয়েছে।

২৬। আসামের পার্বত্য জেলাগুলোতে — কার্বি আংলং ও উত্তর কাছাড় পার্বত্য অঞ্চল যার বর্তমান নাম ডিমাহাসাও — ভারতীয় সংবিধানের ২৪৪এ ধারায় স্বীকৃত স্বশাসিত রাজ্যের দাবিতে দীর্ঘ গণআন্দোলন চালিয়ে আসছে। একের পর এক সরকার কর্তৃক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কণ্ঠস্বরে কর্ণপাত করতে নারাজ হওয়ায় শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের জায়গা নিয়েছে সশস্ত্র বিদ্রোহ এবং ৩ ধারা মোতাবেক পৃথক রাজ্যের দাবি জোরদার হচ্ছে। সরকার ডিমাহাসাও-এর ডি এইচ ডি-র দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী ও কার্বি আংলং ইউ পি ডি এস-এর সঙ্গে পৃথক পৃথক ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এই চুক্তিগুলো পুরোপুরি অপ্রতুল এবং প্রতারণাপূর্ণ বলেই প্রতিপন্ন হয়েছে এবং বাস্তব পরিস্থিতির আদৌ উন্নতি হয়নি। গণতন্ত্র ও উন্নয়নের জন্য জনগণের আকাঙ্খা অধরাই রয়ে গেছে এবং এক স্বশাসিত রাজ্য বা পৃথক পার্বত্য রাজ্যের দাবিতে আন্দোলন জারি রয়েছে। এই অঞ্চলের ঐক্যবোধ ও গণতন্ত্রের স্বার্থে এবং জনগণের অধিকার ও কল্যাণের প্রয়োজনে সি পি আই (এম এল) পৃথক রাজ্য অথবা স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনে অন্যান্য শক্তির সঙ্গে সহযোগিতায় প্রস্তুত।

২৭। বিদর্ভ ও বুন্দেলখণ্ডে পৃথক রাজ্য গঠনের দাবির পিছনেও দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে এবং দাবিগুলোর পক্ষে যথেষ্ট জনসমর্থনও আছে। উন্নততর শাসনের নামে প্রায়শই ছোট রাজ্যের যে তত্ত্ব খাড়া করা হয় তা খারিজ করার সাথে সাথে আমরা জনগণের দীর্ঘদিনের দাবিগুলো মেটাতে নতুন নতুন রাজ্য গঠন সহ যুক্তরাষ্ট্রীয় পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যকে সমর্থন জানাই। এই সমস্ত দাবিগুলোকে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ও নির্দিষ্ট

সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তির জন্য দ্বিতীয় এক রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গঠন করাটাই সবচেয়ে ভালো উপায় হতে পারে। ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের জন্য এবং অনগ্রসর রাজ্য ও অঞ্চলসমূহে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী কৃষির ও শিল্পের বিকাশের জন্য আমরা বিশেষ জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানাই।

২৮। দুর্নীতি সমস্ত সীমাকে অতিক্রম করায়, এক দুর্নীতিমুক্ত শাসন ব্যবস্থার দাবি এখন রণধ্বনি হয়ে উঠেছে। ২০১১-তে আন্না হাজারের নেতৃত্বে জন লোকপাল-এর দাবিতে আন্দোলন ব্যাপক সমর্থন লাভ করে। ঘটনাচক্রে আন্দোলনটি দুটি দিশায় বিভক্ত হয়ে যায় — যার মধ্যে টিম আন্নার একটি অংশ অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নেতৃত্বে আম আদমি পার্টি নামে নতুন দল গঠন করে — যার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হল কংগ্রেস ও বিজেপি মদতপুষ্ট পুঁজিতন্ত্র, যা স্বজন-পোষণের ওপর ভিত্তি করে থাকে। এই বিষয়টি অ-দলীয় ও নির্বাচনে অংশ নেওয়া থেকে বিরত থাকার প্রতিষ্ঠিত এন জি ও রাজনীতির থেকে তাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। আন্না হাজারে ও অরবিন্দ কেজিরওয়াল — উভয়েই দুর্নীতিকে মুখ্যত সরকার চালানোর সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় বলে মনে করে ও যে সমস্ত নীতি এই দুর্নীতি ও কর্পোরেট লুণ্ঠনকে মদত যোগায় তার মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়। বিপরীতে, আমরা কর্পোরেটমুখী নীতিগুলো প্রত্যাহারের দাবি জানাই; কৃষি, অরণ্য ও উপকূলভূমি রক্ষা এবং গ্রামসভাগুলোর অধিকার রক্ষার দাবি জানাই এবং দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনের প্রধান বিষয়বস্তু হিসাবে কালো টাকা ও বেআইনি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা ও খনিজ সম্পদের জাতীয়করণ করার দাবি জানাই। সাথে সাথে আমরা দুর্নীতি বিরোধী অভিযানকে বৃহত্তর গণআন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলেই মনে করি।

২৯। বিভিন্ন ফ্রন্টে ও ইস্যুতে গণআন্দোলনগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের পার্টি উৎসাহভরা ভূমিকা পালন করে চলেছে এবং ধারাবাহিক ও বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করছে। বহু গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামে আমাদের কমরেডদের নেতৃত্বে চালিত গণসংগঠনগুলো সামনের সারিতে থেকেছে। বিধানসভা ও তার সহযোগী অন্যান্য মঞ্চে জনগণের কণ্ঠস্বরকে তুলে ধরার জন্য ঝাড়খণ্ডে আমাদের একমাত্র বিধায়ক প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছেন এবং আদিবাসী ও শ্রমজীবী জনগণের বিভিন্ন আন্দোলনের পাশে থেকেছেন। ২০১০-এর নির্বাচনে বিহারে আমরা বড় ধাক্কার মুখোমুখি হয়েছি, কিন্তু প্রতিকূল নির্বাচনী ফলাফলে বিচলিত না হয়ে পার্টি তার রাজনৈতিক ভূমিকা ও উদ্যোগের বিস্তার ঘটিয়েছে এবং নীতীশ কুমারের সামন্ত-সাম্প্রদায়িক জমানার দৃঢ় ও গতিশীল বিরোধীপক্ষ হিসাবে সামনে এসেছে।

৩০। কর্পোরেট-রাষ্ট্রের ফাঁদে আবদ্ধ দুর্নীতির জাল (এই) ব্যবস্থার যৌক্তিকতাকে প্রবল প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ব্যবস্থাকে বাঁচানোর জন্য বিচারবিভাগ তার সক্রিয়তাকে বাড়িয়ে তুলেছে এবং গভীরতর সংকট থেকে একে উদ্ধারের জন্য নানা সংস্কার কর্মসূচীকে হাজির করা হচ্ছে। অর্থনৈতিক সংস্কারের নামে শাসকশ্রেণীগুলো দেশকে কর্পোরেট লুণ্ঠন ও গভীর অর্থনৈতিক সংকটের দিকে ঠেলে দিয়েছে। আর এখন রাজনৈতিক সংস্কারের নামে তারা জনগণের অধিকারকে খর্ব করতে ও জনগণের

অংশগ্রহণকে সীমায়িত করতে চাইছে। শাসকশ্রেণীকে যদি বিনা বাধায় তাদের মতো এগিয়ে যেতে দেওয়া হয় ভারত তাহলে কর্পোরেট-ফ্যাসিবাদীদের দখলে চলে যাবে। বিপরীতে, আমরা যদি জনগণের মধ্যে মোহমুক্তি ঘটার যে সূচনা হয়েছে তার গভীরতাকে উপলব্ধি করতে পারি এবং জনগণের ক্রোধকে এক প্রগতিশীল দিশায় পরিচালিত করার প্রতিটি সুযোগকে আঁকড়ে ধরতে পারি তাহলে বর্তমান সন্ধিক্ষণেও ন্যায়, গণতন্ত্র ও সামাজিক রূপান্তরণের দাবিতে সংগ্রাম আরও বৃহৎ বৃহৎ বিজয় অর্জন করবে। বিকাশমান পরিস্থিতির পূর্ণ সদব্যবহারের লক্ষ্যে এবং আরও সাহসী পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে পার্টির নবম কংগ্রেস অবশ্যই সংকল্প গ্রহণ করছে।